প্রথম আলো

অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য

ফিলিস্তিনে শান্তি আসবে, কিন্তু তার আগে যা দরকার

আবদুল্লাহ গুল

দুই বছর ধরে ইসরায়েল বর্বর সামরিক অভিযান চালিয়েছে। এতে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে। এমন পরিস্থিতিতে গত অক্টোবরে হওয়া গাজার যুদ্ধবিরতি নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। কিন্তু যুদ্ধবিরতি টিকে থাকলেও স্থায়ী ও ন্যায্য শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্যার মূল কারণগুলো সমাধান করতে হবে। এ উদ্যোগকে 'নতুন শুরু' বলা হলে সেটি ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। মনে হতে পারে সমাধান হয়ে গেছে। যদিও নতুন নিরাপত্তা পরিষদের ২৮০৩ নম্বর প্রস্তাব ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে বৈধতা দিয়েছে, তবু এতে ন্যায়সংগত ফিলিস্তিনি দাবির যথেষ্ট উল্লেখ নেই।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে অবৈধ ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকে স্বাভাবিক করে তোলা। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, ইসরায়েলি আউটপোস্ট বা ছোট ছোট চৌকি ক্রমেই বাড়ছে এবং সেগুলো স্থায়ী বসতিতে পরিণত হচ্ছে। একইভাবে গাজায় 'হলুদ রেখা' চালু হওয়ায় অঞ্চলটি স্থায়ীভাবে ভাগ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এতে ইসরায়েল পুরো এনক্লেভের অর্ধেকের বেশি অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ পাবে। এসব দেখে ইসরায়েল সত্যিই এসব এলাকা থেকে সরে যেতে চাইবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

ট্রাম্পের পরিকল্পনা একটি নতুন শান্তির প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। কিন্তু যে সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে, তার মূল সমাধানগুলো অনেক দিন ধরেই পরিষ্কার। ইসরায়েলের দখলদারি এবং অবৈধ বসতি নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। মর্যাদার সঙ্গে অবশ্যই ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে।

ইসরায়েলের অস্তিত্বগত উদ্বেগও একেবারে অযৌক্তিক নয়। কারণ, দেশটি লেভান্ত অঞ্চলের মাঝখানে, অনেক বৈরী দেশের ঘেরাও অবস্থায় আছে। কিন্তু ইসরায়েলের সেটি বুঝতে হবে, যা বহু আগেই বিশ্বের অনেক ইহুদি বুদ্ধিজীবী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বুঝেছেন। তা হলো ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে এবং আশপাশের অন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে ইসরায়েলের স্বাভাবিক সম্পর্ক দরকার।

ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে এর প্রভাব শুধু ওই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ইসলামি বিশ্বের অনেক উগ্রপন্থা ফিলিস্তিন ইস্যুকে কাজে লাগায়। সংঘাত মিটে গেলে এসব দাবি ও উসকানি দুর্বল হয়ে পড়বে। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের নিজেদের ভেতরেও সংস্কার দরকার। গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতাদের সামনে আনা প্রয়োজন। কেবল এ ধরনের নেতৃত্বই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফিলিস্তিনিদের বৈধ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে এটি আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। ফিলিস্তিনের নেতৃত্বকে বিশ্বাসযোগ্য, বৈধ ও সম্মানজনক হতে হবে।

ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর যে ভয়াবহ ধ্বংস ও কষ্ট নেমে এসেছে, সেই পরিস্থিতিতে নতুন রাজনৈতিক লক্ষ্য

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

ইসরায়েল গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। রয়টার্স

অর্জন করা সহজ হবে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব গঠনের শুরুতে তাদের ধৈর্য ও সমর্থন দেখাতে হবে। ইসরায়েলেরও উচিত এ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা, যদি তারা সত্যিই হামাসের প্রভাব কমাতে চায় এবং অঞ্চলে স্থায়ী স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়।

২০০৬ সালে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমি প্রথম ব্যক্তি, নির্বাচনে বিজয়ের পর আঙ্কারায় হামাস নেতাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎ করি। আমি তাঁদের শক্তভাবে পরামর্শ দিই—তাঁদের নতুন নীতি নিতে হবে এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি রাজনৈতিক শক্তি যেমন আচরণ করে, তেমন আচরণ করতে হবে। অর্থাৎ কূটনীতি ব্যবহার করতে হবে, সংগ্রামে আরও নরম কৌশল গ্রহণ করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফিলিস্তিনিদের বৈধ প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে হবে। তাঁরা শুরুতে এমন ইচ্ছার কিছু লক্ষণও দেখিয়েছিলেন।

আমি আমার ইসরায়েলি ও মার্কিন সমকক্ষদেরও বলেছিলাম, গাজায় নতুন নির্বাচিত নেতৃত্বকে সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। আজ আবার একই ধরনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমি এখনো মনে করি, গণতান্ত্রিক ফিলিস্তিনি নেতৃত্বই একমাত্র পথ। এমন নেতৃত্ব, যারা সুশাসন নিশ্চিত করবে, দুর্নীতি দূর করবে এবং সহিংসতা বর্জন করবে—তারাই জনগণের পূর্ণ সমর্থন পাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে পারবে।

আমি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছি। অনেকেই কারাবন্দী ফিলিস্তিনি রাজনীতিক মারওয়ান বারঘুতিকে সম্ভাবনাময় নেতৃত্বের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইসরায়েলের এটা প্রমাণ করতে হবে, তারা সত্যিই শান্তি চায়। এ জন্য তাঁকে ও অন্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

● **আবদুল্লাহ গুল** তুরস্কের সাবেক প্রেসিডেন্ট

স্বত্ব: **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট**, ইংরেজি থেকে অনূদিত

CamScanner

প্রথম আলো

শিল্পে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, কর্মসংস্থান বাড়েনি

র‍্যাপিডের আলোচনা সভা

রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে ‘বাংলাদেশে বেকারত্বহীন প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানকেন্দ্রিক নীতিকাঠামো’ শীর্ষক এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে গত এক দশকে (২০১৩-২৩) উৎপাদনশীল বা শিল্প খাতে প্রতিবছর গড়ে ১০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে কর্মসংস্থান বাড়েনি। বরং উল্লিখিত সময়ে শিল্প খাতে প্রায় ১৫ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে। এ অবস্থায় প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক নীতি সিদ্ধান্তের বদলে কর্মসংস্থাননির্ভর নীতি গ্রহণে জোর দিতে হবে।

গতকাল রোববার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন অর্থনীতিবিদেরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান।

কর্মসংস্থানবিহীন প্রবৃদ্ধি নিয়ে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিড ও জার্মান গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ফ্রেডরিক এবার্ট স্টিফটাং (এফইএস)। শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য সায়মা হক।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক। তিনি জানান, ‘আমাদের দেশে যে প্রবৃদ্ধি হয়, তার সঙ্গে কর্মসংস্থান তৈরির সরাসরি কোনো সংযোগ নেই। ২০১০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি তিন গুণ বেড়েছে। কিন্তু এ সময়ে এই খাতের কর্মসংস্থানের সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখেই অপরিবর্তিত ছিল। আবার ২০১৩ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের হিস্যা সাড়ে ৪ শতাংশ কমেছে। আর শিল্প খাতের হিস্যা বেড়েছে ৯ শতাংশ। তা সত্ত্বেও উৎপাদন খাতে ১৫ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে। এ সময় উৎপাদন খাতে নারীর অংশগ্রহণও ১৬ শতাংশ কমেছে।’

এম এ রাজ্জাক বলেন, অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু সেই প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান তৈরিতে যথেষ্ট অবদান রাখছে না। অর্থাৎ ‘জবলেস গ্রোথ’ হচ্ছে। ফলে প্রবৃদ্ধি হলেই কর্মসংস্থান হবে, এ ধারণা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এখন সময় এসেছে কর্মসংস্থান তৈরি হবে এমন বিষয়কে কেন্দ্র করে আমাদের সব নীতি পরিকল্পনা গ্রহণের।

‘দুষ্টচক্রের ত্রিভুজে’ আটকে দেশ

অনুষ্ঠানে হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, ২০১৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি ‘দুষ্টচক্রের ত্রিভুজে’ আটকে ছিল। এ সময়ে প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি; সমতা ছিল নীতিনির্ধারকদের নজরের বাইরে; আর শাসনব্যবস্থা জড়িয়ে পড়েছিল দুর্নীতি ও ক্ষমতাশালী ধনীগোষ্ঠীর প্রভাবের মধ্যে। ২০২২ সালের পর একের পর এক সংকট এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ফলে দেশ আজ এমন একপর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে কাঠামোগত দুর্বলতা স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে।

> বাংলাদেশকে দীর্ঘদিন ধরে একটি ‘সহনশীল রাষ্ট্র’ বা রেজিলিয়েন্ট অর্থনীতির দেশ হিসেবে দেখা হয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে দেশ এখন ‘আনন্দহীন রেজিলিয়েন্সের ফাঁদে’ আটকে গেছে।
>
> **হোসেন জিল্লুর রহমান**
> নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

হোসেন জিল্লুর রহমান আরও বলেন, ‘বাংলাদেশকে দীর্ঘদিন ধরে একটি “সহনশীল রাষ্ট্র” বা রেজিলিয়েন্ট অর্থনীতির দেশ হিসেবে দেখা হয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে দেশ এখন “আনন্দহীন রেজিলিয়েন্সের ফাঁদে” আটকে গেছে। অর্থাৎ সহনশীলতা আমাদের শক্তি হলেও বর্তমানে তা আর আনন্দ দিচ্ছে না। সংকট মোকাবিলার চক্র থেকে বের হয়ে আসতে পারছি না।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য সায়মা হক বিদিশা বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন নেই। কৃষক পরিবারের সন্তানেরা এখন কৃষিকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন না। এ জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন বাড়াতে হবে। এ ছাড়া ফ্রিল্যান্সিং ও অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য ছোট নীতি ও প্রণোদনা দেওয়া হলে সেটি বড় ধরনের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনতে পারে।

আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন বলেন, শুধু কর্মসংস্থান তৈরি করলেই হবে না; কর্মসংস্থান হতে হবে গুণগত মানসম্পন্ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শ্রমিক অধিকার একসঙ্গে নিশ্চিত না করলে তা টেকসই হবে না।

কলেজগুলো বেকার তৈরির কারখানা

প্যানেল আলোচনায় বিডিজবসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ কে এম ফাহিম মাশরুর বলেন, ১৫ বছর আগে দেশে তিন লাখের মতো গ্র্যাজুয়েট তৈরি হতো। সেখানে এখন প্রতিবছর সাড়ে ৪ লাখের বেশি গ্র্যাজুয়েট শ্রমবাজারে প্রবেশ করছেন। এর ৭০ শতাংশই আসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো থেকে। এই কলেজগুলো বেকার তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে।

ফাহিম মাশরুর বলেন, প্রতিবছর ১২ লাখ মানুষ বিদেশে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের ৯০-৯৫ শতাংশই মাধ্যমিক পাস। এ অবস্থায় নিম্ন দক্ষতার শ্রমিক রপ্তানিতে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া উচিত বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক ও শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, নতুন প্রযুক্তি ও যন্ত্রের কারণে কর্মসংস্থানের হার কমছে। শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রয়োজন। বর্তমানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কোনো অধিদপ্তর নেই। এটি দেশে কর্মসংস্থান নীতি বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা।

CamScanner

প্রথম আলো

সাগরে নতুন ৬৫ প্রজাতির মাছের সন্ধান

মৎস্যসম্পদ জরিপ

মৎস্য অধিদপ্তর এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) যৌথভাবে এই জরিপ করেছে। দেশি-বিদেশি বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত দল এই জরিপ পরিচালনা করে।

- জরিপে বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ সীমানায় প্রথমবারের মতো টুনা মাছের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।
- কমে গেছে সাগরের পানির ওপরের স্তরের ছোট আকৃতির মাছের পরিমাণও।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের সমুদ্রসীমায় নতুন আরও ৬৫ প্রজাতির মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ৫ প্রজাতির মাছ সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেখা গেছে। এত দিন সাগরে মোট ৪৭৫ প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত। আগের প্রজাতির সঙ্গে এখন নতুন করে এসব মাছের প্রজাতি যুক্ত হবে। এসব মাছের পূর্ব ইতিহাস এবং গোত্র নির্ধারণের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। আবার প্রথমবারের মতো দেশের সমুদ্রসীমায় টুনা মাছের উপস্থিতিও পাওয়া গেছে।

গতকাল রোববার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তর এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) যৌথ উদ্যোগে করা মৎস্যসম্পদ জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। এফএওর সহায়তায় ৮টি দেশের ২৪ জন বিজ্ঞানীর মাধ্যমে মাসব্যাপী এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। জাতিসংঘের একটি গবেষণা জাহাজ এ বছরের ২১ আগস্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে বঙ্গোপসাগরের ৬৮টি স্টেশন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

জরিপ দলের নেতৃত্বে ছিলেন নরওয়ের বিজ্ঞানী এরিক ওলসেন। বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সায়েদুর রহমান চৌধুরী। জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ সীমানায় প্রথমবারের মতো টুনা মাছের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। মাছের পাশাপাশি টুনা মাছের লার্ভা বা বাচ্চাও পাওয়া গেছে। এটার জন্য দেশের মানুষ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছে। এখন টুনা মাছ ধরার জন্য দেশি-বিদেশি বা যৌথ বিনিয়োগ করা যাবে। দেশের সাগরের মাত্র ২০০ মিটার গভীরে মাছ ধরা গেলেও সাগরের ৭০০ মিটার নিচেও মাছের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। আর নতুন প্রজাতির ৬৫ জাতের মাছের বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার গবেষণাগারে পাঠানো হয়েছে। সাগরের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় মাছ ধরা হলেও গভীর সাগরে কোনো মাছ ধরা হচ্ছে না জানিয়ে তিনি গভীর সাগর থেকে মাছ ধরার উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন।

এদিকে জরিপে বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ আহরণ কমে যাওয়ার তথ্যও উঠে এসেছে। দেশের প্রধান ২০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ২০১৮ সালে ৯ প্রজাতির মাছ আহরণের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উপযোগিতা ছিল, কিন্তু এবার তা ৫টিতে নেমে এসেছে। জরিপের তথ্যে বলা হয়, সাগরের পানির ওপরের স্তরের ছোট আকৃতির (স্মল প্যালাজিক) মাছের পরিমাণও কমে এসেছে। ২০১৮ সালে যেখানে স্টক ছিল ১ লাখ ৫৮ হাজার টন, ২০২৫ সালে তা নেমে এসেছে মাত্র ৩৩ হাজার ৮১১ টনে। একইভাবে ২০১৮ সালে গভীর সাগরে জেলি ফিশের উপস্থিতি থাকলেও এখন তা উপকূলের কাছাকাছি চলে এসেছে। ফলে জেলেদের জাল জেলি ফিশে ভরে যাচ্ছে।

জরিপের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে অধ্যাপক সায়েদুর রহমান চৌধুরী বলেন, 'সাগরের ৮০ থেকে ৯০ মিটারের পর অক্সিজেনের মাত্রা কম। কিছু জায়গায় অক্সিজেন নেই বললেই চলে। তবে সাগরে প্রচুর উদ্ভিদের উপস্থিতি দেখা গেছে। আমাদের জাহাজ সাগরের উপকূলের ২০ মিটারের নিচে নামতে পারে না। তাই উপকূলের কোনো তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি।'

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, 'নতুন এ জরিপের ফলাফল আমাদের সমুদ্র ব্যবস্থাপনা, নতুন পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণে সহায়তা করবে। বঙ্গোপসাগরে গবেষণার সক্ষমতা বাড়াতে নতুন জাহাজ কেনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই এটা করতে হবে।'

অনুষ্ঠানে মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশনের সচিব আবিদ হোসেন বলেন, 'সাগরে মাছের পরিমাণ কমছে। এটা আমাদের জন্য খুবই অ্যালার্মিং বিষয়। এটা নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা না হলে সাগরে মাছ ধরা শিল্প হারিয়ে যাবে।'

দুই বছর ধরে সাগরে মাছ নেই বলে মন্তব্য করেন কক্সবাজার ফিশিং বোট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, 'সাগরে মাছ ধরায় ৫৮ দিন নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এটার কোনো সুফল পাচ্ছি না আমরা। সাগরে অবৈধ মাছ ধরা বন্ধে টহল জোরদার করা উচিত।'

CamScanner

প্রথম আলো

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক চূড়ান্ত অনুমোদন পেল

বাংলাদেশ ব্যাংক

এক্সিম ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, গ্লোবাল ইসলামী ও ইউনিয়ন ব্যাংক মিলে নতুন ব্যাংক গঠিত হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে গঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংককে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গতকাল রোববার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাকক্ষে গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অন্য পরিচালকেরাও উপস্থিত ছিলেন।

আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায় শরিয়াহ্‌ভিত্তিক এক্সিম, সোশ্যাল ইসলামী, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, গ্লোবাল ইসলামী ও ইউনিয়ন ব্যাংক মিলে নতুন এ ব্যাংক গঠিত হচ্ছে। নতুন ব্যাংক ৩৫ হাজার কোটি টাকার পরিশোধ মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করবে। এর মধ্যে সরকার দিচ্ছে ২০ হাজার কোটি টাকা। বাকি ১৫ হাজার কোটি টাকা আমানতকারীদের জমানো টাকার বিপরীতে শেয়ার দেওয়া হবে। এ ছাড়া সরকারি তহবিল এই ব্যাংকে রাখা হবে। একই সঙ্গে আকর্ষণীয় মুনাফা দিয়ে সাধারণ আমানতকারীদের অর্থ রাখাতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এ ছাড়া ঋণ আদায়সহ বিভিন্নভাবে তারল্য প্রবাহ বাড়ানো হবে।

জানা গেছে, নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স ইস্যুর পর একীভূত হওয়া পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীদের টাকা ফেরতের বিষয়ে চলতি সপ্তাহে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্কিম কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারে। সেখানে আমানতকারী ব্যক্তিরা কীভাবে টাকা তুলতে পারবেন, তার বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে। শুরুতে আমানত বিমা তহবিল থেকে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত পরিশোধ করা হবে। বাকি টাকা ধাপে ধাপে তুলতে পারবেন আমানতকারী ব্যক্তিরা। কোন উপায়ে টাকা তুলতে পারবেন, কী হারে মুনাফা দেওয়া হবে—এই স্কিমে তার বিস্তারিত ঘোষণা থাকবে।

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের জন্য প্রাথমিকভাবে রাজধানীর মতিঝিলে সেনা কল্যাণ ভবনে একটি কার্যালয় নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় একটি চলতি হিসাবও খোলা হয়েছে। শিগগিরই পরিচালনা পর্ষদ গঠন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হবে। এর আগে বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষে গত ৫ নভেম্বর প্রশাসক নিয়োগ ও ব্যাংকগুলোর শেয়ার শূন্য ঘোষণা করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ৫টি ব্যাংকে বর্তমানে ৭৫ লাখ আমানতকারীর জমা আছে ১ লাখ ৪২ হাজার কোটি টাকা। এর বিপরীতে ঋণ রয়েছে ১ লাখ ৯৩ হাজার কোটি টাকা। বিভিন্ন উপায়ে ঋণের বেশির ভাগ বের করে নিয়েছেন এস আলম, নাসা, বেক্সিমকো, সিকদারসহ কয়েকটি গ্রুপ। ফলে বর্তমানে এসব ব্যাংকের ১ লাখ ৪৭ হাজার কোটি টাকা বা ৭৬ শতাংশ খেলাপিতে পরিণত হয়েছে। সারা দেশে এসব ব্যাংকের ৭৬০টি শাখা, ৬৯৮টি উপশাখা, ৫১১টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এবং ৯৭৫টি এটিএম বুথ রয়েছে। একীভূত হওয়ার পর একই এলাকার একাধিক শাখা মিলে একটি বা দুটি করা হবে। ব্যাংকগুলোর পরিচালন খরচ কমাতে এরই মধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

CamScanner

ইয়াসির এম ফয়সাল

বাঁচাতে হবে শিল্প খাত

পোশাকশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্বে বাংলাদেশ ২য় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৪ ভাগজুড়েই রয়েছে আমাদের এ পোশাকশিল্প বা রেডিমেড গার্মেন্টিস। শুধু তাই নয়, এ পোশাকশিল্পে কাজ করে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। ১৯৮০ সালে মাত্র ১.৮ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানি থেকে বেড়ে সেটি এখন দাঁড়িয়েছে ৪৭ বিলিয়ন ডলারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের অর্থনীতির চালিকাশক্তি এ পোশাকশিল্প বিবিধ কারণে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গত এক বছরের এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ২৫৮টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফলে বিপুলসংখ্যক পোশাক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে। অপর এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, বেকার হয়ে পড়া এ পোশাক শ্রমিকের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি।

এবারে আসা যাক, একের পর এক কেন বন্ধ হচ্ছে পোশাক কারখানা। একটা কারণ হচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ। কেন এ অসন্তোষ? শ্রমিকরা সময়মতো বেতন পান না। তাছাড়া তাদের মজুরি বৃদ্ধি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্যও তারা আন্দোলন করে। শ্রমিকদের অধিকার যেটা, সেটার জন্য আন্দোলন করা ঠিক আছে এবং বেশির ভাগ মালিকপক্ষ সেটা মেনেও নেয়। তবে অনেক সময় শ্রমিকরা তাদের রাইটসের বাইরে অতিরিক্ত চান। এমনসব আবদার করেন, যেটা মালিকপক্ষের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয় না। শ্রমিকদের অনেক ট্রেড ইউনিয়ন আছে, যারা তাদের এ অতিরিক্ত দাবি নিয়ে লাগাতার আন্দোলন করে যায়। এসব আন্দোলনের একটা পর্যায়ে মালিকপক্ষের ফ্যাক্টরি বন্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। কেননা এমনও দেখা গেছে, একেকটি ফ্যাক্টরির মধ্যে ৭-৮টি করে ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। সুতরাং যে ফ্যাক্টরিতে ৭-৮টি ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে, সেখানে আন্দোলনের মাত্রা কী হতে পারে, তা সহজে অনুমেয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রেতারা পণ্যের দাম কমানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের কোনো মার্জিন থাকে না পণ্যের দাম কমানোর জন্য। কারণ গ্যাসের মূল্য, শ্রমিকদের বেতন, এগুলো তো দিন দিন শুধু বাড়ছে। এগুলো আর কমছে না। একদিকে আমাদের উৎপাদন ব্যয় বাড়তে থাকে, ওদিকে বায়াররা পণ্যের দাম কমাতে বলে। সুতরাং বায়ারদের কথা শুনতে গেলে আমাদের প্রোফিট বলতে কিছুই থাকে না। মালিকরা যদি একটু লাভের মুখ দেখে, তাহলে শিল্পে চাঙা ভাব আসবে। রপ্তানির প্রাপ্ত লভ্যাংশ পুনর্বিনিয়োগ হয়ে উৎপাদন বাড়বে। নতুন নতুন আরও কারখানার উদ্ভব হবে। আরও মানুষের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এমনটি খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। লাভ যদি না হয়, তাহলে মালিকরা কেন চালাবে পোশাকশিল্প। ফলে বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দেয়।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট। আমাদের কল-কারখানাগুলোতে গ্যাস-বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে বায়ারদের সময়মতো পণ্য সরবরাহ করা যাচ্ছে না। এ কারণে অনেক শিপমেন্ট বাতিল হয়ে যাচ্ছে। তাই এ বিষয়ে সরকারের পুরোপুরি নজর দেওয়া দরকার। সরকার অস্থির হয়ে গেছে বাইরের ইনভেস্টমেন্ট আনার জন্য। কিন্তু আমাদের যত ইন্ডাস্ট্রি আছে, সেগুলোয় যদি ফুল সাপোর্ট দিতে পারি, নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস, বিদ্যুতের সরবরাহ করতে পারি, তাহলে উৎপাদন বাড়বে। রপ্তানির চাকা গতিশীল হবে। আর রপ্তানির চাকা গতিশীল হলে দেশে বৈদেশিক রিজার্ভ বাড়বে। ফলে বিদেশি

বিনিয়োগ অটোমেটিক আসতে শুরু করবে। সরকারের উচিত হবে ছোটখাটো এসএমই কারখানা যেগুলো রয়েছে, ওদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া। তাহলে এদের থেকেও এক্সপোর্ট সাপোর্ট আসবে।

চতুর্থ বিষয়টি হলো ব্যাংক সুদের হার কমানো। সরকার ব্যাংকের সঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে সুদের হার কমাতে পারে। সুদের হার কমলে মানুষ লোন নিয়ে আরও অন্য শিল্প ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হবে। পঞ্চম বিষয়টি হলো, ব্যবসা শুরু করার কাজটিকে সহজ করে দিতে হবে। কেননা, একটা ব্যবসা শুরু করতে গেলে মিনিমাম ৮-১০টি শুধু লাইসেন্সই লাগে। অন্য কাগজপত্র তো আছেই। এসব লাইসেন্স ও কাগজপত্র জোগাড় করতে করতে ৬-৮ মাস চলে যায়, তাহলে সে আর কী ব্যবসা করবে! ব্যবসা শুরু করতে গিয়ে লাইসেন্সপ্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেকে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। সুতরাং একটা কার্যালয়ে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই যাতে সব লাইসেন্স একসঙ্গে পাওয়া যায়, এমন ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে উদ্যোক্তারা সহজে ব্যবসা শুরু করতে পারবে। উৎসাহ হারাবে না।

ষষ্ঠ বিষয়টি হলো, আমাদের পোশাক রপ্তানির সবচেয়ে বড় ক্রেতা হলো আমেরিকা। ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই বিশাল ট্যাক্স ধার্য করে দেয়। এতে আমাদের পোশাক রপ্তানিকারকরা বিপাকে পড়ে। কারণ আমেরিকা কর্তৃক ট্যাক্স বাড়ানোর কারণে বায়াররা এ ট্যাক্সের ভার আমাদের কাঁধে ফেলতে চাচ্ছে। ট্যাক্স যদি ১০ শতাংশ বাড়ায়, তাহলে বায়াররা বলছে, ৫ শতাংশ তোমরা দাও আর বাকি ৫ শতাংশ আমি দেব। যার কারণে আমাদের পণ্যের মূল্য অনেকাংশেই বেড়ে যাচ্ছে। ফলে লাভ কম হচ্ছে। আবার কিছু কিছু বায়ার বলছে, ট্যাক্সের পুরোটাই আমাদের দিতে হবে। আমার পরিচিত কয়েকজন মালিকের অর্ডারই পুরোপুরি বাতিল হয়ে গেছে এসব কারণে। তারা বিদেশ থেকে সুতা আনিয়ে, এক্সেসরিজ আনিয়ে, কাপড় বানিয়ে শিপমেন্টের জন্য প্রস্তুত করার পর এসব কারণে যখন শিপমেন্ট বাতিল হয়ে যায়, তখন মালিক কতটা ক্ষতির মুখে পড়ে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সব মিলিয়ে দেশকে রপ্তানিমুখর করতে হলে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি ফেরাতে হলে এলসি মার্জিন এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাটা আরও সহজ করে দিতে হবে। ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে দিতে হবে। ট্যাক্সের বিষয়টিকে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস-বিদ্যুতের সরবরাহ বাড়াতে হবে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন এক্সপো বা মেলার আয়োজন করতে হবে। আমাদের দেশে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা হয়, সেটা খুবই অপ্রতুল। পোশাকশিল্পের ফোকাস সেখানে অতটা থাকে না। বিদেশে এ রকম মেলা অনেক হয়, কিন্তু বাংলাদেশে খুব কমই দেখা যায়। বিদেশে অনেক আন্তর্জাতিক মেলা হয়, যেখানে পোশাকশিল্পের প্রোডাক্ট থাকে, সেখানে বিদেশি ক্রেতারা আসে, পণ্য দেখে পছন্দ করে অর্ডার দেয়। আমাদের তৈরি পোশাক নিয়ে আলাদাভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে মেলার আয়োজন করা যেতে পারে। এতে করে বাংলাদেশে বায়াররা আসবে, আমাদের পণ্য দেখবে। এ শিল্পকে ফোকাস করার জন্য বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক মেলার মাধ্যমে বাইরের বায়ারদের দাওয়াত দিতে পারে। এখান থেকে নতুন নতুন বায়ার তৈরি হবে। এতে করে রপ্তানির চাকাতে একটা গতি আসবে। এটা যদি করা যায়, তাহলে ছোটখাটো ফ্যাক্টরি যেগুলো রয়েছে অথবা বড় ফ্যাক্টরি, সবার জন্যই অনেক উপকার হবে। এতে করে আমাদের পণ্য রপ্তানি যেমন বাড়বে, তেমনি আমাদের শিল্প ও কলকারখানাগুলোও বাঁচবে। আমাদের বৈদেশিক রিজার্ভ বাড়বে । দেশের অর্থনীতিতে একটা গতি আসবে। (অনুলিখন : জাকির হোসেন সরকার)

ইয়াসির এম ফয়সাল : *শিল্প উদ্যোক্তা*

CamScanner

জোসেফ মাসাদ

ফিলিস্তিনে মার্কিন ঔপনিবেশিকতার নতুন অধ্যায়

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সম্প্রতি গাজার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তথাকথিত 'শান্তি পরিকল্পনা' গ্রহণ করেছে। এ ঘটনাকে অনেকেই দেখছেন গাজা এবং এর জনগণের ওপর যুক্তরাষ্ট্রকে, বিশেষ করে ট্রাম্পকে নতুন 'ঔপনিবেশিক প্রভু' হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার নামান্তর হিসাবে।

ট্রাম্পের উচ্চাভিলাষ : গত ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প যখন গাজাকে নিয়ে তার পরিকল্পনার কথা প্রথম জানিয়েছিলেন, তখন তিনি গাজাকে পুরোপুরি যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে একটি 'বিনিয়োগ প্রকল্প' হিসাবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই পরিকল্পনায় গাজার সমগ্র ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে গাজাকে 'মধ্যপ্রাচ্যের রিভেরা' (বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র) বানানোর স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। এমনকি ইসরাইলপন্থি সিএনএনও তখন এ পরিকল্পনাকে 'একবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিকতা' বলে আখ্যায়িত করেছিল।

আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে মার্কিন কর্মকর্তারা তখন বলেছিলেন যে, সেখানে কোনো মার্কিন সৈন্য থাকবে না বা জনসংখ্যা স্থানান্তর হবে সাময়িক। কিন্তু এখন জাতিসংঘের ম্যান্ডেট নিয়ে ট্রাম্প তার সেই পুরোনো পরিকল্পনাটিই 'শান্তি পরিকল্পনা'র মোড়কে আবার সামনে এনেছেন। আলজেরিয়া ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (PA) মতো কিছু আরব দেশ ও গোষ্ঠী, যারা যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত হিসাবে কাজ করে, তারা এ পরিকল্পনাকে সমর্থন দিচ্ছে। অন্যদিকে, রাশিয়া ও চীন ভোটদানে বিরত থেকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ফিলিস্তিনিদের ভাগ্য নিয়ে তাদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই।

তবে এ ঘটনা মোটেও অভূতপূর্ব নয়। এটি ফিলিস্তিনের মাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষারই ধারাবাহিকতা, যার শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, প্রায় ২০০ বছর আগে।

আমেরিকান ক্রুসেড: ১৮২১ সালের দিকেই মার্কিন মিশনারিরা ফিলিস্তিনে এসেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে আমেরিকান প্রটেস্টান্টরা জাফায় কৃষিভিত্তিক কলোনি বা বসতি স্থাপনের চেষ্টা করে। তারা একে বলত 'শান্তিপূর্ণ ক্রুসেড'। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইহুদিদের ধর্মান্তরিত করা এবং যিশু খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনের (Second Coming) ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। অবশ্য পরবর্তী সময়ে অ্যাডামস কলোনিসহ একাধিক মার্কিন বসতি স্থাপনের চেষ্টা তখন স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধের মুখে এবং নিজেদের অদক্ষতায় ব্যর্থ হয়েছিল।পরিস্থিতি এখন এমন যে, ট্রাম্পের বর্তমান পরিকল্পনাকে সেই ২০০ বছর আগের ব্যর্থ মার্কিন ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টারই আধুনিক সংস্করণ হিসাবে দেখাটা ভুল হবে না।

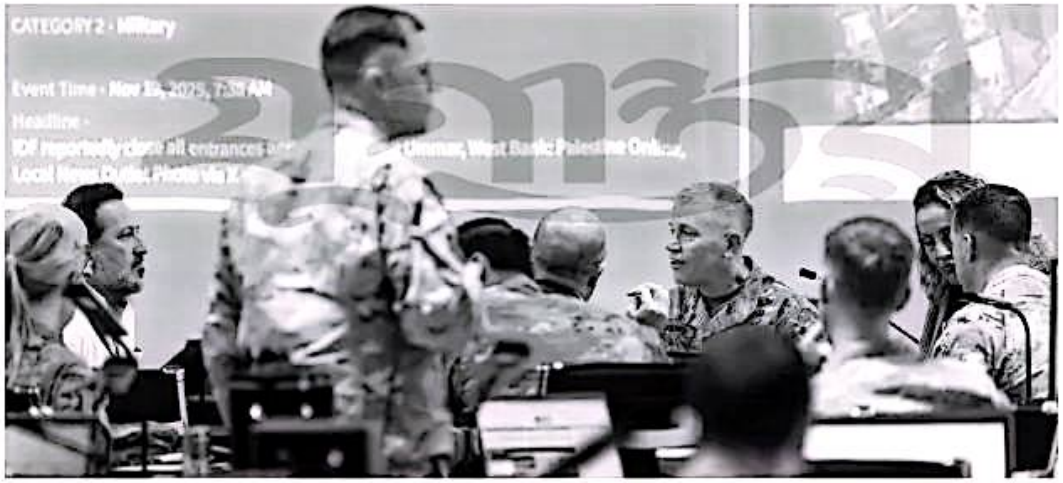

লিওপোল্ডীয় উচ্চাভিলাষ : ট্রাম্প নিজেকে গাজার অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের প্রধান বা তথাকথিত 'বোর্ড অফ পিস'-এর প্রধান হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এমনকি টনি ব্লেয়ারের মতো বিতর্কিত নেতাকেও তিনি এ বোর্ডে যুক্ত করেছেন। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক সাবেক কর্মকর্তা ক্রেইগ মোখিবার তো ট্রাম্পের এ ভূমিকাকে কঙ্গোতে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা লিওপোল্ড কঙ্গোকে যেভাবে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা কলোনি হিসাবে দখল করেছিলেন। সেখানে স্থানীয় মানুষকে দিয়ে জোর করে রাবার সংগ্রহের কাজ করানো হতো এবং অবাধ্য হলে বা কোটা পূরণ করতে না পারলে হাত কেটে ফেলার মতো নিষ্ঠুর শাস্তি দেওয়া হতো। প্রায় ১ কোটি মানুষ সেসময় লিওপোল্ডের নিষ্ঠুরতায় প্রাণ হারিয়েছিল।

কাজেই এমন আশঙ্কা অমূলক নয় যে, গত দুবছরে গাজায় ইসরাইলি হামলায় এবং মার্কিন সহায়তায় যে গণহত্যা চলেছে, ট্রাম্পের প্রত্যক্ষ শাসনে তা হয়তো কঙ্গোর সেই ভয়াবহ ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। কঙ্গোতে লিওপোল্ড চেয়েছিলেন রাবার, আর গাজায় ট্রাম্পের চোখ হয়তো সেখানকার তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের ওপর।

ভবিষ্যৎ কী : ট্রাম্পের শাসনে গাজার ফিলিস্তিনিদের ভাগ্যে কী আছে, তা এখনো অস্পষ্ট। তবে ইতোমধ্যেই হাজার হাজার ফিলিস্তিনি তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারিয়েছেন। ট্রাম্প ও ইসরাইলের এ বিশাল 'শান্তি বাণিজ্যের' বা প্রতারণার মধ্যে একমাত্র যে বিষয়টি তারা হিসাবের মধ্যে আনেনি, তা হলো গাজার মানুষের অবিচলতা ও প্রতিরোধ স্পৃহা। মনে রাখতে হবে, গত দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা বর্বরতার পরও গাজার মানুষ কিন্তু তাদের হার না মানা মনোভাব ধরে রেখেছে।

*মিডল ইস্ট আই থেকে ভাবানুবাদ।

জোসেফ মাসাদ : কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক আরব রাজনীতি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের অধ্যাপক

CamScanner

এক লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা পুনঃতপশিল চান ২০ ব্যবসায়ী

হিসাব: কোটি টাকা

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

■ ওবায়দুল্লাহ রনি

এক হাজার আবেদনের বিপরীতে দুই লাখ কোটি টাকার মতো ঋণ পুনঃতপশিল চাওয়া হয়েছে।

দেশের ২০ ব্যবসায়ী গ্রুপ এক লাখ ১০ হাজার ৩০০ কোটি টাকার ঋণ নিয়মিত করার আবেদন করেছে।

ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ দ্রুত বেড়ে এখন ছয় লাখ ৪৪ হাজার ৫১৫ কোটি টাকায় ঠেকেছে, যা মোট ঋণের ৩৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ। বিপুল অঙ্কের খেলাপি ঋণ কমাতে চলতি বছরের শুরুতে বিশেষ সুবিধায় ঋণ পুনঃতপশিলের সুযোগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

অবশ্য এ তালিকায় এসব ব্যবসায়ীর সব ঋণ রয়েছে এমনটি নয়, ঋণের আংশিক নিয়মিত করতে চেয়েছেন কোনো কোনো ব্যবসায়ী। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুযোগ দিলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সুবিধা দিচ্ছে না বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, হু হু করে সামনে আসা খেলাপি ঋণ কমাতে গত জানুয়ারিতে বিশেষ ব্যবস্থায় ঋণ পুনঃতপশিলের উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। কোনো নীতিমালা না করে শুরুতে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটির মাধ্যমে আবেদন চাওয়া হয়। এই কমিটি মাত্র ২ শতাংশ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ১০ বছরের জন্য খেলাপি ঋণ পুনঃতপশিল, পুনর্গঠনের সুযোগ দেয়। তবে নির্দিষ্ট কোনো সার্কুলার জারি না করে কমিটির মাধ্যমে সুবিধা দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে তালিকায় নাম ওঠানো হচ্ছে– এ রকম অভিযোগও পায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে জানা গেছে, সরাসরি গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এভাবে ঋণ পুনঃতপশিল করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নয়। এ রকম অবস্থায় বিশেষ বিবেচনায় পুনঃতপশিল করে দেওয়ার কথা বলে অনৈতিক পদক্ষেপেরও অভিযোগ আসে। যে কারণে গত সেপ্টেম্বরে একটি সার্কুলারের মাধ্যমে বিশেষ পুনঃতপশিলের বিষয়টি ব্যাংকগুলোর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রথমে বলা হয়েছিল, জুন পর্যন্ত খেলাপি হওয়া ঋণে এ সুবিধা দেওয়া যাবে। পরে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আরেকটি সার্কুলার জারি করে বলা হয়, ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত খেলাপি ঋণে বিশেষ সুবিধার জন্য আবেদন করতে পারবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম সমকালকে বলেন, এভাবে খেলাপি ঋণ কমানো কোনো সমাধান নয়। এ রকম টোটকা দাওয়াই দিয়ে খেলাপি ঋণ সমস্যার সমাধান হবে না।

গত জানুয়ারিতে গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটির কাছে এক হাজার ৪০টি আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে পাঁচটি আবেদনে ৫৫ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকার পুনঃতপশিল চাওয়া হয়েছে। এককভাবে সর্বোচ্চ ১৪ হাজার ৭৭১ কোটি টাকা পুনঃতপশিল চেয়েছে মাগুরা গ্রুপ। আট ব্যাংক ও তিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাদের এই ঋণ রয়েছে।

এস আলম গ্রুপের ১২ হাজার ৭৬৬ কোটি টাকা পুনঃতপশিল চেয়েছে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক। এই আবেদন এস আলমের পক্ষ থেকে করা হয়নি। তাদের পক্ষে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক আবেদন করলেও এতে কোনো সাড়া দেয়নি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

তৃতীয় সর্বোচ্চ ১১ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা পুনঃতপশিলের আবেদন করেছে বসুন্ধরা গ্রুপ। এ ঋণ রয়েছে ২৮ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে।

নজরুল ইসলাম মজুমদারের নাসা গ্রুপ ৯ হাজার ৭২৪ কোটি টাকা নিয়মিত করার আবেদন করেছে। এই আবেদন করেছেন গ্রুপটির ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার মো. সাইফুল আলম।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি, শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ছয় হাজার ৯১৯ কোটি টাকার পুনঃতপশিল চাওয়া হয়েছে। এই আবেদন করেছেন গ্রুপটির নির্বাহী পরিচালক ওসমান কায়সার চৌধুরী। গত বছরের আগস্টে সরকার পতনের পর থেকে নজরুল ইসলাম মজুমদার ও সালমান এফ রহমান জেলে রয়েছেন।

ঋণ পুনঃতপশিলের দৌড়ে ষষ্ঠ অবস্থানে আছে জিপিএইচ ইস্পাত গ্রুপ। ২৮ ব্যাংকে গ্রুপটির ঋণ রয়েছে ছয় হাজার ৮৯৪ কোটি টাকা। এই ঋণ পুনঃতপশিল চেয়ে আবেদন করেছেন গ্রুপটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম।

জানতে চাইলে জিপিএইচ ইস্পাতের কোম্পানি সচিব মো. মোশারফ হোসেন সমকালকে বলেন, তাদের ঋণ খেলাপি হয়েছে তেমন নয়, নিয়মিত আছে। তবে করোনাভাইরাস ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিনিময়হারজনিত লোকসানের কারণে কিছু সমস্যা হচ্ছে। যে কারণে পুনঃতপশিলের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধে এখন বাড়তি সময় চাওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণের নামে বিপুল অঙ্কের অর্থ নিয়ে আলোচিত সাদ মুসা গ্রুপ। বেনামিসহ

পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

CamScanner

এক লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বিভিন্ন ব্যাংকের পাঁচ হাজার ১০০ কোটি টাকার ঋণ পুনঃতপশিলের আবেদন করেছে তারা। এর মধ্যে নিজ নামে ১৬ ব্যাংক ও ছয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। আর দুই ব্যাংক ও এক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বেনামি ৬০০ কোটি টাকা পুনঃতপশিল চাওয়া হয়েছে।

অষ্টম অবস্থানে থাকা ওপেক্স সিনহা গ্রুপ চার হাজার ৪৬৩ কোটি টাকা পুনঃতপশিল চেয়েছে। এ ছাড়া পরিমাণ বিবেচনায় ৩০ ব্যাংকে চার হাজার ১৮৬ কোটি টাকা পুনঃতপশিলের আবেদন করেছে নবম অবস্থানে থাকা আনোয়ার গ্রুপ।

ইসলামী ব্যাংকে নাবিল গ্রুপ চার হাজার ১৬১ কোটি টাকা পুনঃতপশিলের আবেদন করেছে। এর মধ্যে এজে ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের এক হাজার ৩৮৪ কোটি, আনোয়ার ফিড মিলসের এক হাজার ১৭৫ কোটি, নাবিল গ্রেইন ক্রপসের ৯৪০ কোটি এবং নাবা এগ্রো ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের নামে ৬৬২ কোটি টাকার ঋণ নিয়মিত করার আবেদন করা হয়েছে।

পরিমাণ বিবেচনায় ১১ নম্বরে থাকা পারটেক্স ২০ ব্যাংকে চার হাজার ৬২ কোটি টাকা বিশেষ পুনঃতপশিল চেয়েছে। এর মধ্যে পারটেক্স গ্রুপের দুই হাজার ২০০ কোটি এবং পারটেক্স স্টার গ্রুপের রয়েছে এক হাজার ৮৬১ কোটি টাকা।

এর পরের অবস্থানে থাকা গোল্ডেন সনের ১০ ব্যাংকে তিন হাজার ৮৭৪ কোটি, প্রভিটা গ্রুপের ২৩ ব্যাংকে তিন হাজার ৪০৬ কোটি, রুবি ফুড প্রোডাক্টের ১৩ ব্যাংকে তিন হাজার ৩৫৭ কোটি এবং আহসান গ্রুপের ১২ ব্যাংকে তিন হাজার ২৮ কোটি টাকার ঋণ পুনঃতপশিল চাওয়া হয়েছে।

পর্যায়ক্রমে পরিমাণ বিবেচনায় ১৬ নম্বরে থাকা আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালের দুই হাজার ৮৫৭ কোটি এবং মেজর (অব.) মান্নানের সানম্যান গ্রুপের দুই হাজার ৫৪১ কোটি টাকার ঋণ নিয়মিত করার আবেদন করা হয়েছে। আব্দুল মোনেম গ্রুপ ২২ ব্যাংকে দুই হাজার ৫১১ কোটি, ডার্ড গ্রুপ সাত ব্যাংকে দুই হাজার ২১৫ কোটি এবং ১১ ব্যাংকে দুই হাজার ২০১ কোটি টাকার ঋণ নিয়মিত করার আবেদন করেছে জেএমআই গ্রুপ। এরই মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে আবেদন নিষ্পত্তির জন্য ব্যাংকগুলোকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তারা কোনো কোনো আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। আবার সুবিধা অনুমোদন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক চিঠি দিলেও অনেক ব্যাংক সুবিধা দিচ্ছে না।

জেএমআই গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়মিত করার অনুমোদন দিলেও ব্যাংকগুলো তা মানছে না। এতে করে ব্যবসা পরিচালনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অভিযোগ করেছেন তিনি।

বিগত সরকারের সময় খেলাপি ঋণ আড়াল করার সুযোগ ছিল। তবে লুকিয়ে রাখা খেলাপি ঋণ এখন বেরিয়ে আসছে। গত সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ঠেকেছে ছয় লাখ ৪৪ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা। মোট ঋণের যা ৩৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ।

গত বছরের সেপ্টেম্বরের শেষে খেলাপি ছিল দুই লাখ ৮৪ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা, মোট ঋণের ১৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ। সে বিবেচনায় এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে তিন লাখ ৫৯ হাজার ৫৩৮ কোটি টাকা বা দ্বিগুণের বেশি। খেলাপি ঋণ বেশি বাড়লে দেশের ঋণ মান কমাসহ ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা সমস্যা তৈরি হয়। এ অবস্থায় বিশেষ বিবেচনায় খেলাপি ঋণ নিয়মিত করার এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান সমকালকে বলেন, ব্যাংকগুলোর ঋণ শ্রেণীকরণ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তবে এই কঠোরতার কারণে কোনো প্রকৃত ব্যবসায়ী যেন সমস্যায় না পড়েন, সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ঋণ পুনঃতপশিলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

সমকাল

CamScanner

ট্রাম্পের দোদুল্যমানতায় তাইওয়ানকে পেয়ে বসছে চীন

সাইমন টিসডাল

আন্তর্জাতিক

কুৎসা রটনা, ঐতিহাসিক পক্ষপাত এবং পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে সৃষ্ট নিছক অজ্ঞতা প্রায়ই আন্তর্জাতিক সংঘাতে ফুলিঙ্গ হিসেবে ইন্ধন জোগায়। যদি অ্যাডল্‌ফ হিটলার মার্কিন শিল্পশক্তির প্রকৃত পরিধি বুঝতে পারতেন, তাহলে কি তিনি ১৯৪১ সালে ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন? যদিও তিনি স্পষ্টত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন।

১৯৭৯ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান আক্রমণ করে, তখন স্পষ্টতই তাদের কোনো ধারণা ছিল না– তারা কী অবস্থায় পড়তে চলেছে। অপমানজনক পরাজয় তাদের পরবর্তী ভাঙনে বিরাট অবদান রেখেছিল। ১৯৯০ সালে ইরাকের সাদ্দাম হোসেন এই বিশ্বাসে কুয়েত আক্রমণ করেন– তিনি হোয়াইট হাউস থেকে সবুজ সংকেত পেয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে বোকামি ভয়াবহ ভুল সিদ্ধান্তের জন্ম দেয়, যা মারাত্মক পরিণতি নিয়ে আসে।

পশ্চিমা গণতন্ত্রের সঙ্গে চীনের ভেঙে পড়া সম্পর্কও একই রকম বিপজ্জনক গুপ্ত সংকটের মুখোমুখি। চীনা শাসনের অধীনে তাইওয়ানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে 'এক্সপ্লেইনার' নিবন্ধের সাম্প্রতিক প্রকাশনায় পারস্পরিক জ্ঞানের এই অভাবকে হাস্যকরভাবে তুলে ধরেছে।

উক্ত নিবন্ধে বলা হয়েছে, চীন যদি সরাসরি দায়িত্ব না নেয় তখন পরীক্ষিত 'দেশপ্রেমিক' হংকংয়ের আদলে বেইজিং-অনুমোদিত শাসন ব্যবস্থায় তাইওয়ান পরিচালনা করবে। আবার বলুন? তাইপে ও পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হংকং হলো দুঃস্বপ্নের দমন, নৃশংস নিরাপত্তা আইন, সেন্সরশিপ আর ১৯৯৭ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে হস্তান্তরকালে লঙ্ঘন করা চীনা প্রতিশ্রুতির একটি সতর্কতামূলক গল্প।

এমনকি সবচেয়ে অন্ধ কমিউনিস্ট গোষ্ঠীও ভাবতে পারে, তাইওয়ানের নাগরিকরা যারা তাদের গণতন্ত্র এবং কার্যত সার্বভৌম স্বাধীনতাকে লালন করে, স্বেচ্ছায়

> এটা ছিল ব্যতিক্রমী বোকামি। মূলত স্পষ্ট বক্তব্যের প্রতি চীনের উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, যা তাদের তাইওয়াননীতি কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তার ইঙ্গিতবহ। জরিপগুলো দেখায়, তাকাইচির বিতর্কিত আইন জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছে, যদিও এটি প্রায় দৈব ঘটনা।

এই পথ অনুসরণ করবে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লন্ডভন্ড করা হবে। এটা স্পষ্ট– যদিও বেইজিং এটা বুঝতে পারে না।

ঐতিহ্যগতভাবে মার্কিন সমর্থিত তাইওয়ানের ওপর চীনের অবিরাম অবরোধ এখন জোরালো সামরিক চাপের পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছে। দ্বীপটিকে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এবং তাদের পশ্চিমাপন্থি, নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা বেড়েই চলেছে, যেখানে ব্যবহার হচ্ছে গুপ্তচরবৃত্তি, সাইবার-নাশকতা, গণনজরদারি এবং বোকামিপূর্ণ মিথ্যা, ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তিকর তথ্য।

গত সপ্তাহে প্রতিরক্ষা ব্যয় ৪০ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, সংযুক্তির হুমকি 'তীব্রতর হচ্ছে'। ইউক্রেনের মতো তারাও রাশিয়ার অনুরূপ চাপের মুখোমুখি এবং একইভাবে মার্কিন সমর্থনের বিষয়ে অনিশ্চিত। লাই বলেন, সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি হলো, ভীতসন্ত্রস্ত তাইওয়ানিরা কেবল হাল ছেড়ে দেবে।

বিশ্লেষক হ্যাল ব্র্যান্ডস লিখেছেন, "চীনা নেতা শি জিনপিংয়ের প্রথম পছন্দ হলো একটি ধ্বংসাত্মক,

অপ্রত্যাশিত যুদ্ধ ছাড়াই জয়লাভ করা। 'তার পদ্ধতি হলো বলপ্রয়োগ বৃদ্ধি। এটি এক ধরনের ক্ল্যাসিক 'অ্যানাকোন্ডা কৌশল', যা তাইওয়ানের আত্মসমর্পণ না হওয়া পর্যন্ত ক্রমশ কঠোর হতে থাকবে। বিচ্ছিন্নতা এবং নৈতিক অবক্ষয় শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের জন্ম দেবে; আর এ চিন্তাভাবনা দেখা যাচ্ছে।"

ব্র্যান্ডস ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, জবরদস্তি ব্যর্থ হলে শি তারপরও সামরিক শক্তি ব্যবহার করবেন। কিন্তু চীনের মূল লক্ষ্য ছিল 'তাইওয়ানে এই ধারণা তৈরি করা– চীনা শক্তি অপ্রতিরোধ্য। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে এই বিশ্বাস গড়ে তোলা, হস্তক্ষেপ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এর মাধ্যমে তাইওয়ানের জনগণকে একদিন বিশ্বাস করানো– তাদের সর্বোত্তম বিকল্প হলো লড়াই না করেই হাল ছেড়ে দেওয়া।'

ঐতিহাসিক শত্রুতার মূলে থাকা রাজনৈতিক বোকামি গত এক দশকের মধ্যে চীন-জাপান সম্পর্কের সবচেয়ে উত্তপ্ত সংকটের ইন্ধন জোগাচ্ছে। জাপানের নবনির্বাচিত ডানপন্থি প্রধানমন্ত্রী সানে তাকাইচি সংসদে এক এলোমেলো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এটি বিস্ফোরিত হয়। তিনি বলেন, সামরিক উপায়ে চীনা আক্রমণ থেকে তাইওয়ান এবং নিকটবর্তী বাণিজ্য পথগুলোকে রক্ষা করা একটি অস্তিত্বগত সমস্যা, যা 'জাপানের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ'।

উগ্রপন্থি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের শিষ্য তাকাইচি, যিনি কেবল সেই কথাই বলছিলেন, যা তিনি এবং অনেক জাপানি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করে আসছেন; কিন্তু রেকর্ডে তা জোরেশোরে আনুষ্ঠানিকভাবে উঠে এসেছিল। উত্তপ্ত চীন দ্রুত নিষেধাজ্ঞা এবং বয়কট আরোপ করে। উভয় পক্ষই বিতর্কিত দ্বীপপুঞ্জের দিকে সামরিক সরঞ্জাম এগিয়ে নেয়। ওসাকায় চীনের কনসাল জেনারেল একটি টুইটে তাকাইচির 'শিরশ্ছেদ' করার দাবি করেছিলেন, যা পরে মুছে ফেলা হয়েছিল।

এটা ছিল ব্যতিক্রমী বোকামি। মূলত স্পষ্ট বক্তব্যের প্রতি চীনের উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, যা তাদের তাইওয়াননীতি কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার ইঙ্গিতবহ। জরিপগুলো দেখায়, তাকাইচির বিতর্কিত আইন জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছে, যদিও এটি প্রায় দৈব ঘটনা। কিন্তু অজ্ঞতা সুখকর কিছু নয়, মূলত সংঘাতের ঝুঁকিই খুব বেশি।

■ সাইমন টিসডাল: গার্ডিয়ানের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমেন্টেটর; দ্য গার্ডিয়ান থেকে ভাষান্তর ইফতেখারুল ইসলাম

CamScanner

তরুণ উদ্যোক্তাদের চ্যালেঞ্জ

জান্নাতুল ফেরদাউস অহনা

বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত এগোচ্ছে। শিল্পায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও পরিষেবা খাতসহ নানা ক্ষেত্রে খুলছে নতুন সম্ভাবনার দ্বার। দিন দিন দেশের অর্থনীতিতে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে, তরুণ প্রজন্মের উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ আগের মতো নেই। নানা সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যুবকদের একটি বড় অংশ নিরাপদ চাকরির দিকে ঝুঁকছে। শিক্ষা, দক্ষতা, প্রযুক্তি সবই আগের চেয়ে বেশি সহজলভ্য হওয়ার পরও কেন এই অনীহা? বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা জরুরি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা প্রাথমিক পুঁজি। বহু তরুণের নতুন ধারণা থাকলেও তা বাস্তবে রূপ দিতে পরিবারভিত্তিক বিনিয়োগ বা সঞ্চয় থাকে না। কারণ ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক বিনিয়োগ। অধিকাংশ তরুণই পরিবারভিত্তিক পুঁজির অভাবে ভোগেন। ব্যাংক ঋণ পেতে হলে প্রয়োজন জামানত, কাগজপত্র আর দীর্ঘ প্রক্রিয়া যা নতুনদের জন্য বড় বাধা। স্টার্টআপ ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা সহজ শর্তে ঋণ এসব সুবিধা এখনো পর্যাপ্তভাবে পৌঁছায় না।

আমাদের সমাজে স্থায়ী চাকরি এখনো 'নিরাপত্তা' হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের অনেক পরিবারই ব্যবসাকে ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্থির বলে মনে করে। ব্যবসা ব্যর্থ হলে পরিবার ও সমাজ দুই দিক থেকেই চাপ তৈরি হয়। ফলে বহু তরুণ মেধা ও ধারণা থাকা সত্ত্বেও চাকরিকে বেশি স্থিতিশীল মনে করেন। তাছাড়া সমাজে চাকরিজীবী ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে সামাজিক মর্যাদার ধারণাও উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহকে কমিয়ে দেয়। তরুণরা ব্যর্থতার ভয় ও সামাজিক চাপে চাকরিকে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য শুধু ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন বাজার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন, পরিকল্পনা তৈরি, পণ্য উন্নয়ন, হিসাব-নিকাশ, বিপণন- এ সবকিছুতে দক্ষতা। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্যোক্তা-শিক্ষা এখনো সীমিত। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা ইনকিউবেশন প্রোগ্রাম থাকলেও অনেক তরুণ এর নাগাল পান না। একটি ব্যবসা শুরু করতে

আমাদের সমাজে স্থায়ী চাকরি এখনো 'নিরাপত্তা' হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের অনেক পরিবারই ব্যবসাকে ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্থির বলে মনে করে। ব্যবসা ব্যর্থ হলে পরিবার ও সমাজ দুই দিক থেকেই চাপ তৈরি হয়। ফলে বহু তরুণ মেধা ও ধারণা থাকা সত্ত্বেও চাকরিকে বেশি স্থিতিশীল মনে করেন। তাছাড়া সমাজে চাকরিজীবী ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে সামাজিক মর্যাদার ধারণাও উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহকে কমিয়ে দেয়। তরুণরা ব্যর্থতার ভয় ও সামাজিক চাপে চাকরিকে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন

প্রয়োজন ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, ভ্যাট নিবন্ধন, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিভিন্ন অনুমোদন এসব প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে দালালচক্র, অতিরিক্ত সময়, কিছু ক্ষেত্রে হয়রানি। অনলাইন সেবার সুযোগ বাড়লেও বাস্তবে জটিলতা পুরোপুরি দূর হয়নি। উদ্যোক্তা হওয়ার শুরুতেই এমন অভিজ্ঞতা অনেক তরুণকে নিরুৎসাহিত করে।

বাজারের অনিশ্চয়তা ও তীব্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে। দেশি-বিদেশি পণ্য ও ব্র্যান্ডের প্রতিযোগিতা এতই বাড়ছে যে নতুন উদ্যোক্তারা বাজারে নিজেদের স্থায়ী করতে হিমশিম খাচ্ছেন। বিশ্ববাজারের মন্দা, ডলারের ওঠানামা, আমদানি-রপ্তানির নিয়মে পরিবর্তন এসব কারণে অনেকেই ব্যবসাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন। ফলে সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও তরুণের মন পিছিয়ে যায়। একজন নতুন উদ্যোক্তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অভিজ্ঞ কারও দিকনির্দেশনা। কিন্তু দেশে মেন্টরশিপ বা নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম সীমিত। নতুন উদ্যোক্তারা জানেন না কোথায় গেলে পরামর্শ পাওয়া যাবে, কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলা যায়, কীভাবে বাজার বিশ্লেষণ করতে হয়। ফলে শুরুতেই একাকিত্ব ও অনিশ্চয়তা ভর করে।

উদ্যোক্তা হওয়ার পথে ব্যর্থতা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যর্থতাকে লজ্জা হিসেবে দেখে। একবার ব্যবসায় ক্ষতি হলে পরিবার-সমাজ এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় যে অনেক তরুণ দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার সাহস পান না। উদ্যোক্তা সংস্কৃতি বিকাশে এই মানসিকতা বড় বাধা। উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনা অনেক। এজন্য, প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা। বাংলাদেশের যুবসমাজ বিশ্বমানের আইডিয়া, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা রাখে। তাই উদ্যোগ কমে যাওয়ার এই প্রবণতা থামাতে হলে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। যেমন- সহজ শর্তে স্টার্টআপ ফান্ড ও ঋণপ্রাপ্তি, উদ্যোক্তা- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে বড় পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া, ব্যবসার নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া আরও সহজ করা, দেশের প্রতিটি জেলায় নেটওয়ার্কিং ও মেন্টরশিপ কেন্দ্র স্থাপন, পরিবার ও সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন, ব্যর্থতাকে উদ্যোক্তার শেখার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা। বাংলাদেশের তরুণদের হাতে অসীম সম্ভাবনা আছে। শুধু সঠিক সহায়তা ও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারা দেশের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

লেখক : শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

CamScanner

ভূমিকম্পে জাপান, হাইতি ও চিলি থেকে শিক্ষণীয়

ড. মো. মাইন উদ্দিন

২০১১ সালের ১১ মার্চ জাপানের সেন্দাই শহরে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়, যার মাত্রা ছিল ৯.১। ভূমিকম্পটি শুরু হয় বেলা ২টা ৪৬ মিনিটে এবং স্থায়ী হয় ছয় মিনিট। অসংখ্যবার আফটারশক (পরাঘাত) হয়, যেগুলোর কোনো কোনোটির মাত্রা ছিল ৭-এর ওপরে। ঐ ভূমিকম্পে প্রায় ২০ হাজারের মতো মানুষ মারা যায়।

তখন ছিল শীতকাল, তাপমাত্রা থাকত মাইনাস ও মাঝেমধ্যে বরফ পড়ত। আমি তখন ঐ শহরের তোহোকু বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছিলাম এবং পরিবার নিয়ে সেখানে বসবাস করছিলাম।

ভূমিকম্পের সময় আমি ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে, আমার স্ত্রী বাসায় আর আমাদের চার বছরের মেয়ে তার স্কুলে। আমি ক্যাম্পাসে ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম সদ্য নির্মিত বড় একটি গেমস রুমে। আমি দৌড়ে কাঠের একটি শক্ত কাঠামোর নিচে শুয়ে ছিলাম ভূমিকম্প না থামা পর্যন্ত। এরপর বাইরে বের হয়ে অন্যদের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি।

আমার স্ত্রী বাসায় থাকার কারণে ভূমিকম্পের তীব্রতা বেশি টের পেয়েছে। আমাদের বাসা ছিল দোতলায়। ভূমিকম্প শুরু হলে সে একটি শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নেয়। ভূমিকম্পের তীব্র ঝাঁকুনিতে তার চোখের সামনে বাসার ফ্রিজটি কয়েক ফুট সামনে চলে যায় এবং একটি বড় বুকশেলফ রুমের এক কোণ থেকে মধ্যখানে চলে আসে। পানির কল নিজে নিজে খুলে যায় ও পানি পড়তে শুরু করে।

ভূমিকম্প থামার পর ইন্দোনেশিয়ান এক প্রতিবেশীর সঙ্গে সে দোতলা থেকে নিচে নেমে আসে। এরপর আমার স্ত্রী মেয়েকে আনতে স্কুলে চলে যায়। স্কুল থেকে তাকে জানানো হয়, ভূমিকম্পের সময় শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছিল। যেহেতু সুনামির সতর্কবার্তা ছিল তাই শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের হস্তচালিত গাড়িতে বসিয়ে উঁচু স্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু পরে সতর্কবার্তা তুলে নেওয়ায় শিশুদের ক্লাসরুমে নিয়ে আসা হয়।

আমাদের বাসার মালিকের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম, বাসায় থাকা অনিরাপদ হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আমরা প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে চলে গেলাম। আশপাশের স্কুলগুলোকে আশ্রয়কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়েছে। স্কুলগুলো ওভাবেই তৈরি করা। আমরা তিন দিন সেখানে ছিলাম। আমাদের নিয়মিত দুই বেলা খাবার দেওয়া হয়েছে। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে সুশৃঙ্খলভাবে খাবার নিয়েছি। মুঠোফোনে চার্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্রের বাইরে অনেকগুলো অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছিল। একসময় আশ্রয়কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে যায়। আগুন লাগার মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে অগ্নিনির্বাপক গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স ও হেলিকপটার চলে আসে। অল্প সময়ের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আশপাশের দোকানগুলোতে খাবার কেনার লাইন পড়ে যায়। সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় শুকনা খাবার, বাচ্চাদের দুধ ও ওষুধ কিনে নেয়।

ভূমিকম্পের পর কোনো কোনো বিদেশি শিক্ষার্থী এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা আর পড়াশোনায় মন বসাতে পারেনি। কেউ কেউ ডিগ্রি শেষ না করেই যার যার দেশে ফিরে যায়। যারা পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিল, তাদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের পরামর্শের ব্যবস্থা করা হয়। এক বছর পর যেসব শিক্ষার্থী এই ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে, তাদের ওপর একটা জরিপ করা হয়।

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে উঠি, তখন আমাদের বাসাটির সবচেয়ে শক্তিশালী জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে আমরা ভূমিকম্পের সময় সেখানে আশ্রয় নিতে পারি। এ-ও বলা হয়েছিল যে ঐ ছাত্রাবাসগুলো সাত মাত্রার ভূমিকম্প-সহনীয় করে তৈরি করা হয়েছে। অথচ ৯ মাত্রার ভূমিকম্পের পরও সেগুলো অক্ষত ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রুমে আমরা পড়াশোনা করতাম, সেখানে প্রত্যেক টেবিলে একটি করে হেলমেট দেওয়া ছিল, যাতে ভূমিকম্প হলে আমরা ওটা পরে টেবিলের নিচে আশ্রয় নিতে পারি। টেবিলগুলোও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। ভূমিকম্প হলে কী কী করতে হবে সে নির্দেশনাও ছিল। যেমন তিন তলা কিংবা তার ওপরে যারা ছিল, তাদের ভূমিকম্পের সময় দৌড়ে নিচে না নামার নির্দেশনা ছিল। প্রত্যেক ফ্লোরের কোন কোন জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে, তা নির্দিষ্ট করা ছিল। সবাই একত্রে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে কী বিপদ ঘটতে পারে, সে ব্যাপারেও শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের ঐ বিল্ডিংটিতে ভূমিকম্প হওয়ার ১০ সেকেন্ড আগে সতর্কবার্তা পেতাম।

> জাপানে রাস্তাঘাট এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক বাসা পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্স ও অগ্নিনির্বাপক গাড়ি ঢুকতে পারে। বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্মাণবিধি মানতে হয়। ফলে ভূমিকম্পের ক্ষতি হয় ন্যূনতম। তারা সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক উঁচু ভবন তৈরি করেছে, যা ভূমিকম্পের সময় দুলবে কিন্তু ভাঙবে না

জাপানের স্কুলগুলোতে শিশুদের ভূমিকম্পের সময় করণীয় সম্পর্কে যাবতীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আবার কৃত্রিমভাবে সাত মাত্রার ভূমিকম্প তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করা হয়। এ সময় তারা যা শিখেছে, তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রায় প্রত্যেক বাসায় শুকনা খাবারের একটি প্যাকেট প্রস্তুত করে রাখা হয়, সঙ্গে কিছু কাপড়চোপড়। ভূমিকম্প হলে তারা ঐ ব্যাগটি নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যেতে পারে।

জাপানে রাস্তাঘাট এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক বাসা পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্স ও অগ্নিনির্বাপক গাড়ি ঢুকতে পারে। বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্মাণবিধি মানতে হয়। ফলে ভূমিকম্পের ক্ষতি হয় ন্যূনতম। তারা সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক উঁচু ভবন তৈরি করেছে, যা ভূমিকম্পের সময় দুলবে কিন্তু ভাঙবে না।

২০১০ সালের ১২ জানুয়ারি হাইতিতে সাত মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল, যেখানে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ২০ হাজার। মৃত্যুর কারণ যতটা ছিল ভূমিকম্পের প্রভাবে, তার চেয়ে বেশি ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত নির্মাণশিল্প তথা আবাসিক খাতের কারণে। পৃথিবীতে নির্মাণশিল্প হলো সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত খাত; কালোটাকা এখানে বিনিয়োগ করা হয়।

হাইতিতেও একই রকম ঘটনা ঘটেছিল। দুর্নীতির প্রকোপ এসে পড়েছিল নির্মাণশিল্পে। দুর্নীতির টাকা ব্যাপকভাবে আবাসনশিল্পের চাহিদা তৈরি করেছিল। সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ খেয়ে ঠিকাদারদের দালান তৈরির অনুমতি দিয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে চাহিদার জোগান দিতে গিয়ে জমি ভরাট করা হয়েছিল বিধিবিধান না মেনে; দালানের নকশা ছিল ত্রুটিপূর্ণ; দালান তৈরির উপকরণ ছিল নিম্নমানের।

অন্যদিকে ২০১০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি চিলিতে ৮.৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। চিলির নির্মাণশিল্প ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। তাদের ভবননির্মাণবিধি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। ভূমিকম্প-প্রতিরোধী ভবন তৈরি ছিল বাধ্যতামূলক। নির্মাণশিল্পের নিলাম, অনুমতি, নির্মাণকালীন তদারকি ও পরিদর্শন ছিল অত্যন্ত কঠোর। সর্বোপরি, দেশে আইনের শাসন ও স্বাধীন বিচার বিভাগ ছিল। ফলে তাদের নির্মাণশিল্পের মান ছিল অনেক উন্নত। তাই তাদের দেশে বড় ভূমিকম্প হলেও হাইতির মতো ব্যাপক ভবনধস ঘটেনি। মৃত্যুর সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫০।

নিকোলাস এম্ব্রাসেস ও রজার বিলহ্যাম ২০১১ সালে দুর্নীতি ও ভূমিকম্পে জীবনহানি নিয়ে নেচার-এ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তারা দেখান, নির্মাণশিল্পের দুর্নীতি ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যাকে ব্যাপক হারে বাড়িয়ে দেয়। ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা যতটা ভূগোল নিয়ন্ত্রিত, তার চেয়ে বেশি মানবসৃষ্ট-নির্মাণশিল্পের দুর্নীতির মাধ্যমে।

দুর্নীতির সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণশিল্পের সম্পর্ক দেখতে যে সময়ে ভবনগুলো তৈরি হয়েছে, সে সময়ের দুর্নীতি বিবেচনায় নিতে হবে। উপসংহারে তারা বলেন, অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণশিল্প একটি সম্ভাব্য খুনি এবং কোনো সমাজের সার্বিক সততা তার নির্মাণশিল্পের সততার থেকে বেশি শক্তিশালী হয় না।

বাংলাদেশ এক সময় দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন ছিল। এর পরও আমাদের দেশে দুর্নীতির মাত্রা একটুও কমেনি। তবে আমরা প্রথম স্থান ধরে রাখতে পারিনি অন্যান্য দেশের দুর্নীতির মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে।

গত আড়াই দশকে আমাদের দেশে দুর্নীতির সঙ্গে নির্মাণশিল্পও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। জলাশয় ভরাট করা হয়েছে আবাসনশিল্পের জন্য; ভবন তৈরির বিধি সঠিকভাবে মানা হয়নি; নির্মাণশিল্পের উপকরণ কেমন ছিল, তা আমরা জানি না। যদি ভূমিকম্পের মাধ্যমে আমাদের নির্মাণশিল্পের মান যাচাই করতে হয়, তবে তা হবে আমাদের জন্য ভয়াবহ। এ বাস্তবতা আমাদের মেনে নিতেই হবে। সবাই মিলে যে পাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত না করে উপায় কী!

● লেখক : অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রস্তুতিতে কতটা এগিয়ে বাংলাদেশ

মোহাম্মদ সফিউল আযম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আজ বিশ্ব জুড়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা, প্রশাসন সব জায়গায় এআই সিদ্ধান্ত গ্রহণকে দ্রুততর করছে, তথ্য বিশ্লেষণ সহজ করছে, আর সেবা প্রদানের মান বাড়াচ্ছে। কিন্তু এই অগ্রগতির মধ্যেও বড় প্রশ্ন থেকে যায়, এআই কি সবার জন্য সমানভাবে উপকারী হবে, নাকি নতুন ধরনের বৈষম্য তৈরি করবে? এই বিবেচনা থেকেই ইউনেসকোর ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র ২০২১ সালে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিকতা-সংক্রান্ত সুপারিশ' গ্রহণ করে, যেখানে এআই ব্যবহারের জন্য স্পষ্ট নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। একই সময়ে ইউনেসকো এআই রেডিনেস অ্যাসেসমেন্ট মেথডোলজি (র‍্যাম) তৈরি করে, যাতে বোঝা যায় একটি দেশ নৈতিক ও দায়িত্বশীল এআই ব্যবহারের জন্য কতটা প্রস্তুত।

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। সম্প্রতি দেশের প্রথম জাতীয় এআই প্রস্তুতি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই পথ আরো স্পষ্ট হয়েছে যেখানে প্রযুক্তি মানুষের সহায়ক হবে, প্রতিযোগী নয়। নৈতিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবকেন্দ্রিক এআই এই ধারণাকে সামনে রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এটুআই, ইউনেসকো, ইউএনডিপি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জাতীয় এআই প্রস্তুতি প্রতিবেদন। এতে শুধু প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নয়, নৈতিকতা, বৈচিত্র্য, অন্তর্ভুক্তি ও মানবাধিকারও সমান গুরুত্ব পেয়েছে।

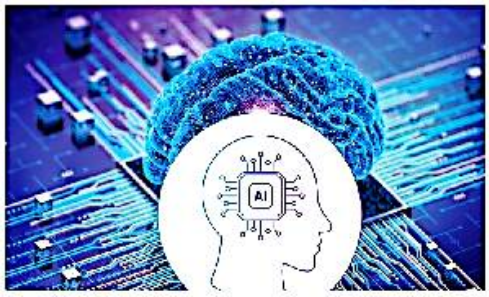

বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ডিজিটাল সেবা ও ই-গভর্ন্যান্সে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। মাইগভ, ই-নথি, ন্যাশনাল পোর্টাল, মুক্তপাঠ, নাগরিক সেবা, ডিজিটাল সেন্টার সব মিলিয়ে সরকারি সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। অনলাইনে জন্মনিবন্ধন, পাসপোর্ট আবেদন, স্কুল ভর্তি, ভূমি সেবা, কর পরিশোধসহ বহু প্রক্রিয়া আগের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত ও স্বচ্ছ হয়েছে। এই সাফল্যগুলো এআই ব্যবহারের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করলেও সামনে মোকাবিলা করতে হবে বেশকিছু বড় চ্যালেঞ্জ।

ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এখনো মাত্র ৪৪ শতাংশ। শহর-গ্রামের সংযোগ বৈষম্য, মানসম্পন্ন স্মার্ট ডিভাইসের সীমিত প্রাপ্যতা, ডেটার উচ্চমূল্য সব মিলিয়ে ডিজিটাল ব্যবধান গভীর হচ্ছে। নারীদের ডিজিটাল অংশগ্রহণও তুলনামূলকভাবে কম, যা ভবিষ্যতে এআইচালিত শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে তাদের পিছিয়ে দিতে পারে।

আইন ও নীতি কাঠামোর দিক থেকে বাংলাদেশ অগ্রসর হচ্ছে। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ এবং সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ ২০২৫ গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। তবে আধুনিক এআই যেসব জটিল নৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি তৈরি করে, তা মোকাবিলায় আরো বিস্তৃত কাঠামো প্রয়োজন। এজন্য র‍্যাম প্রতিবেদনে একটি জাতীয় এআই গভর্ন্যান্স অফিস এবং স্বাধীন ডেটা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে, যাতে নীতি বাস্তবায়ন, অডিট, নজরদারি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সুসংহতভাবে পরিচালিত হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য। অধিকাংশ এআই মডেল ইংরেজিসহ বিশ্বের কিছু প্রধান ভাষায় প্রশিক্ষিত। ফলে বাংলা বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা এগুলো অনেক সময় অনুবদ্ধ থাকে। এআই যাতে সত্যিকারার্থে সবার জন্য হয়, সেজন্য বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ ডেটাসেট তৈরি এবং নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার ডিজিটাল সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। এটি শুধু সাংস্কৃতিক সম্মানই নয় বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তি নির্মাণের পূর্বশর্ত।

গবেষণার ক্ষেত্রেও বড় সম্ভাবনা থাকলেও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। প্রায় ২ হাজার এআই সম্পর্কিত গবেষণা প্রকাশিত হলেও আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় তা এখনো সীমিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এআই গবেষণা ল্যাব, স্টার্টআপ ইনকিউবেটর, শিল্প-একাডেমিয়া সহযোগিতা এবং বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। কৃষি, স্বাস্থ্য, ভাষা প্রযুক্তি ও ফিনটেকে কিছু ভালো উদ্যোগ দেখা গেলেও এখনো আরো কার্যক্রমের সুযোগ রয়েছে।

র‍্যাম প্রতিবেদনে ১৫টি সুপারিশ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে : অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় এআই নীতি চূড়ান্ত করা; ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা ও সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ আরো শক্তিশালী করা; সরকারি ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল এআই গ্রহণের জন্য সমন্বিত ক্রয়নীতি প্রণয়ন; তথ্য অধিকার আইন হালনাগাদের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; ডেটা সংগ্রহ ও ব্যবহারে বৈচিত্র্য ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি; কেন্দ্রীয় এআই গভর্ন্যান্স অফিস এবং বহুপক্ষীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন; নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করতে স্বাধীন ডেটা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা; এআই বিক্রেতাদের জন্য সার্টিফিকেশন কমিটি গঠন; বাংলা ও নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় ডেটাসেট তৈরি; জনসচেতনতা বৃদ্ধি; মেয়েদের ও নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ পাঠ্যক্রম; বড় পরিসরে দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা-উদ্ভাবনে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ।

বাংলাদেশের সামনে এখন সুযোগ রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায় নৈতিক ও মানবকেন্দ্রিক এআইর উদাহরণ হয়ে ওঠার। এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সমন্বিত পরিকল্পনা, টেকসই বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব। র‍্যাম প্রতিবেদন শুধু আমাদের প্রস্তুতি নয়, আমাদের দায়িত্বও স্মরণ করিয়ে দেয়।

আজকের সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে আগামী দিনের বাংলাদেশ, যেখানে প্রযুক্তি হবে মানুষের সহযাত্রী, মানুষের প্রজ্ঞার সম্প্রসারণ। নীতি থেকে বাস্তবায়ন সব জায়গায় মানবিকতা, স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারলে এআইনির্ভর ভবিষ্যতের সেরা উদাহরণ হয়ে উঠতে পারবে বাংলাদেশ।

● লেখক : প্রাবন্ধিক ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ

CamScanner

চাকরি নাকি উদ্যোক্তা

মনজুর রশীদ বিদ্যুৎ

দীর্ঘদিন ধরেই দেশে চাকরি পাওয়া যেন সোনার হরিণ পাওয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছেছে। বিশেষ করে স্বপ্নবাজ তরুণ—যারা উচ্চতর শিক্ষা সম্পন্ন করে কর্মসংস্থানে প্রবেশের আশায় অপেক্ষা করছেন, তাদেরকে এখন আরেক নতুন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে গিয়ে মানসিকভাবে আঘাতগ্রস্ত হতে হচ্ছে।

দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর হাতেগোনা কিছু যুবক বিসিএস ক্যাডার বা নন-ক্যাডারভুক্ত সার্ভিসের সুযোগ পেলেও এ সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। ফলে বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে খুঁজতে থাকেন বেসরকারি বা প্রাইভেট জব। কিন্তু এক্ষেত্রেও বেশির ভাগ নিয়োগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। নিয়োগকর্তারা একটি বারও ভাবেন না, অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া না হলে সেই সুযোগটা তারা কীভাবে পাবেন? ফলে একদিকে যেমন সমাজে হতাশাবাদী তরুণ ও অভিভাবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সঙ্গে শিক্ষিত অনেক যুবকদের মধ্যে হীনম্মন্যতা এবং তা থেকে মাদকাসক্তিসহ নানাবিধ অপরাধের মাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলেছে!

আবার দেশের বেসরকারি সেক্টরে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দুই ভাবেই বিনিয়োগ মারাত্মকভাবে সংকুচিত হওয়ায় অনেক শিল্প-কলকারখানা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এতে করে এখানেও চাকরির ক্ষেত্র সীমিত হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে অনেকেই চাকরি হারিয়ে বেকার জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন। কর্মজীবীরাও ভবিষ্যত ঝুঁকির কথা ভেবে যারপরনাই চিন্তিত। তার ওপর আবার এনজিও সেক্টরের প্রধান দাতা সংস্থা ইউএসএআইডির তহবিল বন্ধ ঘোষণার পর থেকে অন্য দাতাগোষ্ঠীও তাদের তহবিল এদেশে গুটিয়ে আনছে। এ কারণে অনেকে চাকরি হারাচ্ছেন। এ রকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে জীবন-জীবিকায়নের সংকটের মুখে ক্ষতবিক্ষত দেশের দক্ষ ও অদক্ষ, অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সব শ্রেণিপেশার মানুষ।

একেবারে চাকরির বিজ্ঞপ্তি নেই, তা নয়, কিন্তু সেখানে আবেদনের ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ। সচরাচর একজন চাকরি প্রার্থীকে তার ব্যস্ত সময়ের মাঝেও আলাদা করে অনেকখানি সময় বের করে নিতে হয়। যেমন : ১. নিয়মিত চাকরির বিজ্ঞাপনে তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপযুক্ত চাকরির অফার খুঁজে পাওয়া। ২. সবকিছু মিললে নিজের বায়োডাটা আপডেট করা ও কাভার লেটার লেখা। ৩. ধীরগতির ইন্টারনেটের কারণে অনলাইনে আবেদনের পিছনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করার ঝক্কিঝামেলার পাশাপাশি আবেদনে অভিজ্ঞতার ফিরিস্তি লিখতে পোড়াতে হয় সময়।

এত পথ পাড়ি দেওয়ার পর ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন হলে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান পেয়ে প্রাথমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে (কখনো মৌখিক অথবা লিখিত) আবার ডাকা হয় পরবর্তী পরীক্ষার জন্য (চূড়ান্তভাবে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, অথবা যে কোনো একটি পরীক্ষার জন্য)। কিন্তু সেটি নির্ভর করে ঐ সংস্থার নিয়োগ ভাবনার ওপর। কোনো কোনো সংস্থার মানব সম্পদ বিভাগ থেকে আবার এই পরীক্ষাগুলোতে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়া ওপরের দিকে থাকা তিন-চার জনকে পাঠানো হয় ঐ সংস্থার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত টিম (সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম) কিংবা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট বসের কাছে তার চূড়ান্ত পছন্দ জানার জন্য। মূলত বসের সিদ্ধান্তই এমন নিয়োগে চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান আবার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পর মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার জন্যও আলাদাভাবে ডাকে। এ পর্যায় পর্যন্ত আসলে ধরে নেওয়া হয় প্রার্থী একেবারেই নতুন চাকরি প্রাপ্তির দ্বারপ্রান্তে। তখন বাকি থাকে শুধু স্বাস্থ্য পরীক্ষা আর রেফারেন্স চেক।

এতগুলো ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর যদি বুঝতে পারেন যে (কেউ বলবে না কিন্তু বোঝা যায়), কেবল জেন্ডার বা লৈঙ্গিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করায় আপনি বাদ পড়েছেন অথবা পূর্ব নির্ধারিত ব্যক্তিকে নেওয়ার বৈধতা হিসেবে এতগুলো পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, তখন আপনার মানসিক অনুভূতি কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়।

অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, অনেক প্রতিষ্ঠান আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখে এই পদে তারা নারী নাকি পুরুষ অথবা ঐ সংস্থার ভেতর থেকে কাউকে নেবে কি না! যদিও কাগজেকলমে বা কোনো ডকুমেন্টে এর কোনো প্রমাণ কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে কেউ অনুসন্ধান করলে খুঁজে পাবে না। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে তারা তথ্যপ্রমাণ দিয়েই দেখিয়ে দেবে কীভাবে তারা সঠিকভাবে যোগ্য প্রার্থীকেই খুঁজে বের করে নিয়েছে। তাহলে এত সব নাটকের কি দরকার? কারণ, একেকটি নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য একেকজন প্রার্থীকে কর্মব্যস্ত সময়ের মধ্যেই প্রচুর প্রস্তুতি নিতে হয়। দূরদূরান্ত থেকে রাজধানীতে ছুটে আসা প্রার্থীদের আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও প্রতিবার আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া বাবদ কী পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয়, তা ভুক্তভোগীরাই কেবল জানে। অথচ নিয়োগের নামে এমন প্রহসন দেখার যেন কেউ নেই! অবশ্য সব প্রতিষ্ঠানই কিন্তু এ রকম নয়।

জীবনভর এসব খারাপ অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তি পেতে এবং আরো অনেকের পাশে দাঁড়ানোর বড় পন্থা হতে পারে যুব অবস্থা থেকেই নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। কর্মসংস্থানের একটি বড় অধ্যায় হলো আত্মকর্মসংস্থান। যারা উদ্যোক্তা তারা কেবল নিজের দায় নেন না, তারা সমাজের একটি বড় দায়ও কিন্তু নিজের কাঁধে নিতে পারেন। তাই বেকারত্ব ঘুচাতে চাকরি করতে হবে—বৈশ্বিক পরিবর্তনধারায় দেশের যুবসমাজের এ মনোভাবে পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি। তবে যুব উদ্যোক্তা হতে চাইলে সাহসী হয়ে ঝুঁকি নেওয়া, লেগে থাকা ও সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর বিকল্প নেই।

● লেখক : সমাজ বিশ্লেষক, গবেষক ও উন্নয়নকর্মী

CamScanner

বাড়ছে বৈষম্য ও দারিদ্র্য

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন এবং বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জন কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে উৎপাদিত সম্পদের সুফল ন্যায্যতার ভিত্তিতে সবার মাঝে বণ্টনের ব্যবস্থাকরণে ব্যর্থতা

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ২০২৫'-এ বাংলাদেশের দারিদ্র্যপ্রবণতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্য পরিস্থিতি কিভাবে বিস্তার লাভ করছে এবং সমাজকে প্রভাবিত করছে, তার উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। চার বছর ধরেই বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি ঘটেছে। ২০২২ সালে বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের হার ছিল ১৮.৭ শতাংশ, যা এ বছর শেষের দিকে ২১.২ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। বর্তমানে দেশের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা তিন কোটি ৬০ লাখ। আরো ছয় কোটি ২০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে অবস্থান করছে, যারা সামান্য অভিঘাতেই দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যেতে পারে। দারিদ্র্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং কর্মসংস্থানের অভাব। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় ২০ লাখ কম কর্মসংস্থান হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার মান সাংঘাতিকভাবে নিম্নমুখী হয়েছে। একই সঙ্গে কর্মোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করতে না পারার কারণে একজন শিক্ষার্থী চাকরির বাজারে গিয়ে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। যাঁরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন, তাঁরা কার্যত অহমিকাপূর্ণ বেকারে পরিণত হচ্ছেন। কারিগরি প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার অভাবে কর্মসংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা থেকে মাঝ পর্যায়ের দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিয়েছে।

দারিদ্র্যের নানা রূপ রয়েছে। অনেকেই কর্মসংস্থান হারিয়ে পরিবার চালানোর জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছেন। সার্বিকভাবে উৎপাদনশীল সেক্টরকে গতিশীল করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য উৎপাদনশীল খাতে গতি বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। দেশে ব্যাপক হারে কলকারখানা স্থাপিত হলে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উৎপাদন খাত মন্থর হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং নানা সামাজিক অস্থিতিশীলতার কারণে উদ্যোক্তারা নতুন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধান্বিত। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যক্তি খাতে ব্যাংকঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.২৯ শতাংশ। এটি বিগত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। কাঁচামাল, ক্যাপিটাল মেশিনারিজ এবং মধ্যবর্তী পণ্য আমদানিও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। বিদেশি বিনিয়োগ আহরণের ক্ষেত্রেও মন্দা লক্ষ করা যাচ্ছে।

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, একটি পরিবারের আর্থিক দুর্দশা রোধ করতে হলে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আগেকার দিনে একটি পরিবারের একজন মাত্র সদস্যের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেলে পুরো পরিবার তার উপার্জনের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারত। এখন আর্থিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পরিবারের একজন সদস্যের উপার্জনের ওপর নির্ভর করে অন্যদের টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে পরিবারের একাধিক সদস্যের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

যেসব ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে, সেখানেও উপযুক্ত মজুরি বা বেতন-ভাতার নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। উচ্চ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মজুরি বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত অনেক পরিবারই নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

বিগত সরকারের আমলে যেসব সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে দরিদ্র পরিবারের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিত্তবান পরিবারগুলো সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা ভোগ করছে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ৩৫ শতাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে বিত্তবান পরিবার। মানুষের একটি সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, তারা কর্মমুখী জনপদ বা অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়।

বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি অর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু সেই উন্নয়নের সুফল ন্যায্যতার ভিত্তিতে বণ্টন করা সম্ভব হয়নি। ফলে উন্নয়নের সুফল সামান্য কিছু বিত্তবান পরিবারের হাতে চলে গেছে। এতে ধনী-দরিদ্রের মাঝে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবধান আরো বেড়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল মানুষের মাঝে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সুরক্ষা দেওয়া। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ কর্তৃক 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শীর্ষক পোস্টারের কথা নিশ্চয় অনেকেরই মনে থাকার কথা। সেই পোস্টারে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে আমরা ২২ পরিবারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। এখন ২২ হাজার পরিবারের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মানুষের মাঝে বিদ্যমান আয়বৈষম্য ছিল অনেকটাই সহনীয় পর্যায়ে। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে দেশে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতির বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হয় শহর থেকে গ্রামে। ফলে বিত্তবান ও বিত্তহীনের মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়তে থাকে দ্রুতগতিতে। আওয়ামী লীগ দুর্নীতিতে কতটা সিদ্ধহস্ত, তা বিগত ১৬ বছরে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বিনা ভোটে নির্বাচিত সরকারের জনগণের কাছে কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না। ফলে তারা দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর একজন পিয়ন ৪০০ কোটি টাকার সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। তাহলে যাঁরা একটু ওপরের পর্যায়ে ছিলেন, তাঁরা কী পরিমাণ অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছেন, তা সহজেই বোধগম্য। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান চালিয়ে বিগত সরকারের আমলে নেতা-নেত্রীদের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, তা বিস্ময়কর। দেশের বাইরে একজন প্রতিমন্ত্রীর তিন শতাধিক বাড়ি ও ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়া গেছে। মন্ত্রীরা দেশের বাইরে বাড়ি ও ফ্ল্যাট ক্রয় করলেও দেশে বাস্তুচ্যুৎ মানুষের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ সালের পর থেকে প্রবৃদ্ধির সুফল পেয়েছে ধনীরা। ফলে দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগ আরো বেড়েছে। বাংলাদেশে সম্পদের অভাব নেই। এ ছাড়া বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের সুবর্ণ সময়ে অবস্থান করছে। প্রায় ২০ বছর ধরে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে। একটি দেশের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বয়স যখন ১৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ কর্মক্ষম সীমার মাঝে থাকে, সেই অবস্থাকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বলা হয়। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থা একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে অনুকূল বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থনীতিবিদদের মতে, একটি দেশে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থা একবারই সৃষ্টি হয়। আবার কারো কারো মতে, হাজার বছরে একবার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেসব দেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার সুযোগ কাজে লাগাতে পারে না, তারা উন্নয়নের শিখরে উঠতে পারে না। চীনে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করেছে। তারা এর সুযোগ পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে জাপান ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থা থেকে দূরে সরে আসার কারণে তার উন্নয়নের গতি কিছুটা হলেও মন্থর হয়ে পড়েছে। জাপান ৪৪ বছর ধরে বিশ্ব অর্থনীতিতে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। চীন সম্প্রতি জাপানের সেই অবস্থানকে অতিক্রম করে বিশ্ব অর্থনীতিতে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এরই মধ্যে বাংলাদেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। অর্থাৎ আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার সুযোগ হারাতে চলেছি।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন এবং বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জন কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে উৎপাদিত সম্পদের সুফল ন্যায্যতার ভিত্তিতে সবার মাঝে বণ্টনের ব্যবস্থাকরণে ব্যর্থতা। যাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁরাই মনে করেন দেশটি তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি। অর্জিত সুফল ভোগ করার জন্য তাঁরাই একমাত্র দাবিদার।

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশ এক নতুন যুগে পদার্পণ করেছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তার মাধ্যমে দেশে একটি গণতান্ত্রিক ও মানবদরদি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে জনগণ প্রত্যাশা করে। ভবিষ্যতে যাঁরা সরকার গঠন করবেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে জনগণ যদি বিরূপ হয়, তাহলে মহাশক্তিধর সরকারও ব্যর্থ হতে পারে।

সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে এটি বলা যায় যে অন্তর্বর্তী সরকার দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য দূরীকরণের তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। তাই ভবিষ্যতে যাঁরা সরকার গঠন করবেন, তাঁদের দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য নিরসনের ইস্যুটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। এটি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হবে দ্রুত একটি গণমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, যার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে দারিদ্র্য হ্রাস পেতে পারে।

লেখক : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত

CamScanner

বিনিয়োগ খরায় বাড়ছে ব্যাংকের সুদ ব্যয়

জয়নাল আবেদীন খান, ঢাকা

সরকার পরিবর্তনের পর ঋণ দেওয়া-সংক্রান্ত শর্তাবলি শিথিল হওয়ায় ব্যাংকগুলোতে আমানতের প্রবণতা বেড়েছে। কিন্তু সেই আমানত বিনিয়োগে রূপান্তরিত না হওয়ায় ব্যাংকগুলোর হাতে জমা তারল্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরের আগস্টে এই অতিরিক্ত তারল্য ৩ লাখ কোটি টাকার ওপর পৌঁছেছে। এ অবস্থায় ব্যাংকগুলো বাধ্য হয়ে আমানতকারীদের উচ্চ সুদ দিতে হচ্ছে, যা তাদের ব্যয়কে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, ব্যাংকগুলো এই অতিরিক্ত টাকা সঞ্চয়কারীদের ৮-১০ শতাংশ হারে সুদ প্রদানে ব্যয় করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চলতি বছরের আগস্টে ব্যাংক খাতে অতিরিক্ত তারল্য পৌঁছেছে ৩ লাখ ৬ হাজার ১১২ কোটি টাকায়। একই সময়ে গত বছর এর পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৭৪ হাজার ৫৬৭ কোটি টাকা। এক বছরের ব্যবধানে অতিরিক্ত তারল্য বেড়েছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৫৪৫ কোটি টাকা। এর পাশাপাশি কিছু ব্যাংক প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ সংরক্ষণ করায় মোট তারল্য দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩২ হাজার ৮১৪ কোটি টাকা, যদিও আগস্টে প্রকৃত চাহিদা ছিল ২ লাখ ২৬ হাজার ৭০২ কোটি টাকা।

ব্যাংক এশিয়ার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরফান আলী বলেন, 'সরকারের পালাবদলের পর ব্যাংক খাতে কিছু সংস্কার ও পদক্ষেপ নেওয়া হলেও দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ এখনো স্থিতিশীল হয়নি। উচ্চ সুদের হার, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বিনিয়োগের পূর্ব হিসাবনিকাশ মিলিয়ে অনেকে ঋণ নিতে সাহস পাচ্ছেন না। ফলে ব্যাংকে মোটা অঙ্কের টাকা অলস পড়ে রয়েছে। এসব টাকার কোনো অর্থনৈতিক বা উৎপাদনশীল ব্যবহার হচ্ছে না। অথচ গ্রাহকের অর্থ জমা হওয়ার বিপরীতে বা আমানতকারীদের ঠিকই সুদ দিতে বাধ্য ব্যাংকগুলো। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি দাবি করেন, আশা করা যায়, সামনে ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙা হবে, তখন বিনিয়োগ বাড়বে। এতে ঋণের চাহিদা বাড়বে এবং তারল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে আসবে। ব্যাংকের সুদদণ্ডও একটা পর্যায়ে আর থাকবে না।'

সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে দেখা গেছে, আগস্ট শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত ছয় ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্য দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪৩ কোটি টাকা। প্রচলিত ধারার ৪৩ বেসরকারি ব্যাংকে অতিরিক্ত তারল্য ১ লাখ ৭৩ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা। ১০টি ইসলামি ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্য ৬ হাজার ৫০৯ কোটি টাকা এবং ৯টি বিদেশি ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্য ৩২ হাজার ১১৮ কোটি টাকা।

ব্যাংকভিত্তিক অবস্থান অনুযায়ী, সোনালী ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্য সর্বোচ্চ ৬২ হাজার ৩২২ কোটি টাকা। এরপর ব্র্যাক ব্যাংকের ১৮ হাজার ৮৭৭ কোটি, পূবালী ব্যাংকের ১৮ হাজার ৩৯৮ কোটি, অগ্রণী ব্যাংকের ১৮ হাজার ৩৫১ কোটি, ব্যাংক এশিয়ার ১৭ হাজার ৯০৫ কোটি, ডাচ্-বাংলার ১৬ হাজার ২২০ কোটি, যমুনা ব্যাংকের ১৪ হাজার ৮০১ কোটি, রূপালী ব্যাংকের ১২ হাজার ৫৫৩ কোটি, সিটি ব্যাংকের ১২ হাজার ৪৮১ কোটি এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ১২ হাজার ৩৫৯ কোটি টাকা।

অতিরিক্ত তারল্য হিসাব করা হয় স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রেশিও (এসএলআর) এবং ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) বজায় রাখার পর। ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকে মোট আমানতের ৪ শতাংশ নগদে এবং ১৩ শতাংশ ট্রেজারি বিল-বন্ডের মাধ্যমে রাখতে হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অপর হালনাগাদ প্রতিবেদন বলছে, চলতি বছরের আগস্টে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় আমানতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ দশমিক ২ শতাংশ এবং ঋণে প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ২৫ শতাংশ। এ সময় ব্যাংকগুলো আমানতের বিপরীতে ৮ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দেয়। তবে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ৯.৮৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক ও সহকারী মুখপাত্র শাহরিয়ার সিদ্দিক বলেন, 'বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কম হওয়ায় ব্যাংকগুলোর অতিরিক্ত তারল্য বাড়ছে। যদিও তা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিনিয়োগ অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংকগুলো ঋণের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে চেষ্টা করছে। একটা সময় পর বিনিয়োগ বাড়লে ঋণের প্রবৃদ্ধিও বাড়বে।'

হিসাব কোটি টাকায়

আমানত-তারল্য চক্রের প্রভাব

- ঋণের শর্ত শিথিলে আমানত বৃদ্ধি
- বিনিয়োগ কমায় উদ্বৃত্ত তারল্য
- আমানতের অর্থে সুদ ব্যয় ৮-১০%

অতিরিক্ত তারল্যের নমুনা

আগস্ট ২০২৫	৩,০৬,১১২
আগস্ট ২০২৪	১,৭৪,৫৬৭
এক বছরে বৃদ্ধি	১,৩১,৫৪৫

কিছু ব্যাংকের অতিরিক্ত সংরক্ষণে

মোট তারল্য	৫,৩২,৮১৪
প্রকৃত চাহিদা	২,২৬,৭০২

ব্যাংকভিত্তিক তারল্য

রাষ্ট্রায়ত্ত ৬ ব্যাংক	১,০০,০৪৩
৪৩ বেসরকারি ব্যাংক	১,৭৩,৯৫১
১০ ইসলামি ব্যাংক	৬,৫০৯
৯ বিদেশি ব্যাংক	৩২,১১৮

পরিস্থিতি বদলালেই ঋণের চাহিদা বাড়বে সুদ ব্যয় কমবে

মো. শওকত আলী খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংক

পরিস্থিতি বদলালেই উদ্যোক্তারা ঋণ নিতে আগ্রহী হবেন, এতে ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমবে অতিরিক্ত তারল্যের বোঝা। এভাবে ব্যাংক যখন স্বাভাবিক ঋণচক্রে ফিরে আসবে, তখন আমানতের বিপরীতে যে বড় অঙ্কের সুদ দিচ্ছে, সেই ব্যয়ও শূন্যে নেমে আসবে।

অন্যদিকে ব্যাংকের শক্তির মূল ভরসাই গ্রাহক। রাজনৈতিক পালাবদলের পর দুর্বল ব্যাংকগুলোর নানান দুর্বলতা প্রকাশ্যে চলে আসায় অনেক আমানতকারী তাঁদের টাকার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। ফলে এসব ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের আমানত সরতে থাকে এবং তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থায় থাকা ব্যাংকগুলোয় জমা হতে থাকে। এতে কম সময়ে ভালো ব্যাংকগুলোর তারল্য দ্রুত ফুলে ওঠে। কিন্তু এই প্রবাহ যত দ্রুত বাড়ছে, সেই গতিতে ঋণ বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে যথাযথ যাচাই-বাছাই, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ভালো গ্রাহক চিহ্নিত করতে সময় লাগে। এতে ঋণপ্রবাহ কিছুটা শ্লথ হলেও আমানত সংগ্রহের ধারাবাহিকতা কিন্তু থেমে থাকে না। সেই কারণে তারল্যের পাহাড় তৈরি হয়, যা বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ না থাকলে ব্যাংকের জন্য চাপ হয়ে দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ব্যাংক ঋণ বিতরণ বাড়াতে না পারলেও অলস পড়ে থাকা আমানত যেন অকার্যকর না হয়, এ জন্য তারা অগ্রাধিকার খাতে ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি সরকারি সিকিউরিটিজ, ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ করছে। কারণ, আমানতকারীদের সঞ্চয়ের অর্থ ব্যাংক যতক্ষণ ধরে রাখে, ততক্ষণই তাদের সুদ দিতে হয়। ফলে বিনিয়োগ স্থবির থাকলে এই সুদই পরিণত হয় ব্যাংকের বাড়তি ব্যয়ে।

তবে অর্থনীতিতে আবার গতি ফিরলে এবং বিনিয়োগের পরিবেশ পরিষ্কার হলে এখন ব্যাংকগুলোর হাতে জমে থাকা এই তারল্যই আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করবে। অতএব পরিস্থিতি বদলালে অর্থাৎ নতুন বিনিয়োগ এলে, ঋণের চাহিদা বাড়লে বর্তমান উদ্বৃত্ত তারল্য আর থাকবে না; বরং ব্যাংকিং খাতকে স্বস্তির জায়গায় ফিরিয়ে আনবে।

CamScanner

How coastal women farmers fighting climate risks

MOTAHER HOSSAIN

Although women in Bangladesh are engaged in diverse professions, their work often remains undervalued, overlooked, and unrecognized. Instead of receiving appreciation for their labor, they frequently encounter social stigma, criticism, and discrimination. Among the most affected are marginalized women farmers, whose lives are shaped by both gender inequality and climate change-induced hardships. These women balance household responsibilities with agricultural labor, yet their daily existence lacks peace, happiness, and recognition. Their contribution remains hidden behind structural barriers and social norms that rarely acknowledge their role in sustaining families and ensuring food security.

In many remote regions, nearly half of the working population consists of women farmers. Given their immense contribution, it is crucial that they receive recognition as professional farmers. Official acknowledgment through agricultural cards, free healthcare services, and proper access to district, upazila, and union-level health centers is essential. A seminar held in the capital, organized by COAST Foundation with co-organizers Abhash, Street Child, and Bindu, highlighted these issues and emphasized the urgent need to formally recognize marginalized women farmers and address their challenges.

Bangladesh is among the countries most vulnerable to climate change. Cyclones, floods, salinity intrusion, droughts, and river erosion threaten agricultural production, livelihoods, and food security each year. Women play critical roles in agriculture-preserving seeds, transplanting seedlings, harvesting crops, storing food, and raising livestock. Yet despite their deep involvement, they remain excluded from climate adaptation planning and policy-making. Their knowledge, built over generations through lived experience, is invaluable for understanding real climate impacts and designing practical adaptation strategies. Institutional recognition of women farmers' leadership and active participation in national adaptation planning is now more urgent than ever.

In coastal areas, where nearly one-third of the country's land and 28 percent of its population reside, climate change's impacts are particularly severe. Cyclones, tidal surges, salinity, river erosion, and changing rainfall patterns have become common threats. According to the World Bank, around 12 million people in these coastal regions are directly at risk. Rising sea levels, increasing by about 3-4 millimeters per year, contribute to permanent waterlogging in low-lying areas. Salinity has spread 10-15 kilometers inland, damaging farmland, drinking water sources, and livestock feed. Lands that once produced three seasonal crops now struggle to grow even a single salt-tolerant crop. Women farmers, who manage seed preservation, transplantation, and household food security, face declining income opportunities as agricultural productivity drops. They also bear additional burdens such as traveling long distances to collect safe drinking water, seeking alternative livelihoods, and ensuring their families remain fed in times of crisis.

Climate change has become one of the greatest threats to global life and economic stability. The latest UN Intergovernmental Panel on Climate Change report warns that if global temperatures exceed 1.5°C, the consequences will be devastating for low-lying and coastal countries like Bangladesh. Although the Paris Agreement obliges developed nations to reduce emissions, support adaptation, and increase financial contributions, these commitments remain largely unmet. As a result, countries like Bangladesh face rising risks and economic losses, with around 7 million people affected annually and damages amounting to nearly 2 percent of GDP.

Bangladesh has adopted several national climate strategies, including the Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, the National Adaptation Plan, and Delta Plan 2100. However, challenges persist due to insufficient international funding, slow technology transfer, and limited local adaptation capacity. While national policies prioritize women's participation, safety, and empowerment, implementation gaps hinder progress. Many coastal and river-eroded areas still lack safe shelters, sanitation facilities, and maternal health services tailored for women. Ensuring equal access to these essential services is vital.

Government support is also necessary to improve women farmers' access to technology, climate-resilient seeds, credit, training, and markets. Gender-sensitive budgeting, monitoring, and data collection are essential to address their needs effectively. Women's leadership in local governance and community decision-making must be strengthened so they can contribute to agricultural planning and climate adaptation.

Despite their vital roles, women farmers in coastal regions still face limited institutional support and poor market access. Government budgets allocate resources for women in agriculture, but much of it fails to reach coastal communities. Many women remain excluded from land ownership-only 3.48 percent owned land in 2013-resulting in exclusion from subsidies, training, insurance, and formal credit. Although farmer cards were introduced in 2015-16, women were largely left out. Experts note that women miss out on financial and technological assistance, khas land leases, government incentives, and fair wages. Actively integrating women into the agricultural system could reduce poverty and malnutrition by up to 17 percent.

Some progress has been made. The "My Home, My Farm" project supported 1.57 million women by 2020. The Department of Agricultural Extension has trained over six hundred thousand women in improved farming techniques, food processing, preservation, and ICT applications. Government programs mandate that at least 30 percent of participants in commercial agriculture training be women. These steps have encouraged increased participation in fruit cultivation, poultry farming, and other livelihood activities.

Still, women's contributions remain underrecognized. Even though nearly half of the agricultural labor force is female, lack of land ownership keeps them outside formal systems of subsidies, training, and market opportunities. National agricultural policies must formally recognize women farmers at all levels to ensure they access government incentives and climate-resilient technologies. Climate adaptation initiatives must integrate women's rights, experiences, and leadership to be effective.

In coastal and disaster-prone areas, priority should be given to investments in rainwater harvesting, community water tanks, and solar-powered purification systems, with women guiding implementation. Women must also be involved in managing irrigation systems, salinity control structures, and river or canal sluice gates. They are not merely victims of climate change-they are innovators, problem-solvers, and potential leaders. Climate adaptation efforts will succeed only if built on women's leadership. Policymakers must therefore adopt the approach of "Climate Adaptation in Agriculture with Women's Leadership" to create a more resilient and equitable future.

The writer is Editor, Climate Journal24.com and General Secretary, Bangladesh Climate Change Journalist Forum (BCCJF)

CamScanner

Bangladesh must act now to secure future of its RMG sector

AHAMEDUL KARIM CHOWDHURY

Bangladesh's ready-made garment sector has long been our economic anchor, lifting millions from poverty and placing the country firmly on the global apparel map. Few national success stories have been as transformative or as central to our national identity. Yet today, this industry-responsible for the overwhelming majority of our export earnings-stands at a critical turning point. The signs are clearer than ever: a deepening shortage of skilled workers, widening regional disparities in industrial participation, rising factory closures in key manufacturing hubs, mounting global compliance pressures, and a troubling pattern in which young Bangladeshi women continue to pursue risky overseas domestic work in the absence of secure options at home. If we fail to respond with urgency, Bangladesh risks forfeiting the competitive edge it has earned over decades of resilience, discipline, and sacrifice.

Despite these challenges, Bangladesh remains an important sourcing destination. International buyers still value the country's progress in safety, compliance, and capacity. In fact, during the first half of 2025, Bangladesh briefly became the top supplier of T-shirts to the U.S. market, a milestone that demonstrates continued global confidence. Buyers remain interested in expanding orders, but this interest increasingly comes with new expectations: faster delivery, higher volumes, more value-added products, and a rapid shift toward apparel based on man-made fibres. Global requirements have evolved, and unless Bangladesh modernizes its production base and builds a sustainable workforce pipeline, buyers will simply channel their orders to countries that are better prepared to meet these demands.

At the same time, troubling developments on the ground expose the fragility of our current model. More than 350 garment factories across Savar, Gazipur, Narayanganj, and Chattogram have reportedly closed over a 14-month period, leaving over 100,000 workers jobless. Additional closures have been noted as buyers cut back on orders and insist on price reductions that many factories cannot absorb. Production costs have risen sharply due to persistent gas shortages, higher electricity tariffs, and expensive raw-material imports. Delivery delays, particularly in maritime shipping, have forced many exporters to rely on costly air freight, further eroding competitiveness. Buyers, operating in a tightening global marketplace, are increasingly shifting a portion of their orders to alternative sourcing destinations-an early warning that Bangladesh can no longer take its dominance for granted.

Equally urgent is the shift in global demand away from cotton-based apparel toward high-performance, synthetic, and blended garments. These products-athleisure, sportswear, outerwear, and technical textiles-now dominate global growth. Yet Bangladesh remains heavily dependent on cotton while countries like Vietnam and China surge ahead in man-made fibre production. Encouragingly, industry bodies such as BGMEA have recently expressed interest in building closer links with global MMF suppliers, including potential imports from the United States. Analysts continue to call for diversification into blended yarns, recycled fibres, fancy yarns, and multi-fibre technologies to prevent erosion of the country's competitiveness. While these developments signal awareness, progress remains slow. Without a robust MMF supply chain-spinning, weaving, dyeing, and finishing-Bangladesh risks remaining trapped in low-value segments of the global apparel market at precisely the moment when buyers expect sophistication and speed.

At the heart of these structural challenges lies a fundamental weakness: the absence of a modern, scalable workforce development system. Factory managers across the country struggle to recruit workers. The steady flow of young women from rural areas-once the backbone of the sector-has slowed significantly, shaped by changing family aspirations, demographic shifts, and the widespread promotion of overseas job opportunities. The industry's growing skill requirements have outpaced traditional on-the-job learning models, yet Bangladesh has never developed an institutional structure capable of bringing school dropout girls, unemployed youth, or underserved rural populations into a training pipeline that leads to stable employment. For decades, the sector functioned on spontaneous labour supply driven by economic necessity. That model has reached its limit. Families increasingly prefer to keep daughters closer to home or consider overseas opportunities, even when such opportunities place young women at risk of exploitation in unsafe and unregulated domestic work.

This is not merely an economic challenge but a moral one. Bangladesh's reputation suffers when vulnerable young women leave the country for precarious domestic jobs abroad. While skilled migrations such as nursing, caregiving, and medical support-should be encouraged, the export of untrained teenage girls into foreign households offers neither dignity nor security. The solution lies in creating structured, residential training systems that remove financial barriers and provide safe, supportive environments for disadvantaged youth. Successful models exist elsewhere in Bangladesh's social landscape: institutions that attract a steady intake by offering accommodation, food, and structure to families who otherwise lack options. The concept can be adapted-not for religious instruction but for technical and vocational training. If BGMEA, the Bangladesh Technical Education Board, and the Bangladesh Skill Development Authority developed residential training academies at national scale, they could create a reliable pipeline of workers able to meet the evolving needs of the modern garment industry. Training could include literacy and numeracy support, machine operation, MMF-focused technical skills, and guaranteed job placement. Such an approach would transform vulnerable youth from potential migrant domestic workers into skilled contributors to the national economy.

There have been encouraging signs. Institutions such as the Jamalpur Textile Institute-recently renamed and restructured-reflect an acknowledgment by the government of the need for practical, residential, industry-oriented training. National training programmes such as SEIP have also demonstrated the feasibility of competency-based skills development. Yet these initiatives, while valuable, are far too small in scale. Bangladesh needs dozens of such institutions, not a handful, if it wants to secure a long-term labour pipeline for its most important export sector.

The challenge is not limited to skills. Bangladesh's industrial geography remains dangerously concentrated. Dhaka, Gazipur, Narayanganj, and Chattogram are overstretched, congested, and increasingly unsustainable as long-term industrial hubs. Meanwhile, many rural and semi-urban districts remain disconnected from the industrial economy, despite having labour pools ready for employment. Properly planned and serviced garment zones in new regions could dramatically reduce migration pressure, spread economic opportunities more equitably, and position the industry closer to untapped labour markets. But expansion must be strategic, not haphazard. Infrastructure, transport, utilities, housing, and worker services must be integrated into the planning framework from the outset. If done correctly, new garment zones could reshape Bangladesh's economic geography for the next generation.

Alongside workforce shortages and geographic imbalance, sustainability has emerged as an urgent frontier. Bangladesh now produces more than half a million tonnes of textile waste annually yet recycles only a fraction. Global buyers, especially those operating under strict environmental regulations such as the EU's new sustainability rules-are demanding transparency, waste reduction, and circular production. Failure to address environmental performance could cost Bangladesh access to key markets. Conversely, developing domestic recycling and circular-fashion infrastructure could reduce raw-material imports and create a new competitive advantage for the industry.

The path forward is clear. Bangladesh must modernize its fibre base, invest in MMF capabilities, scale up national skills development, create residential training academies for disadvantaged youth, reduce the outflow of vulnerable women into unsafe foreign domestic work, expand the industrial footprint into new regions, and invest deeply in sustainability. These steps require coordination between government, industry associations, development partners, and global brands-many of whom are willing to support initiatives that enhance supply-chain stability and social impact.

Bangladesh's garment sector has been a story of courage, determination, and nation-building. We now have the opportunity to write its next chapter with intention. The world's buyers are watching, our young people are waiting, and the window of opportunity-though narrowing-remains open. Whether we seize it or squander it will determine not only the future of our export economy but the future of millions of families whose lives are intertwined with industry. It is time to act with boldness, vision, and urgency. The next twenty years of Bangladesh's prosperity depend on the choices we make today.

The writer is Port Shipping & Logistics Strategist; Former Head of ICD Kamalapur & Pangaon ICT, CPA; Adjunct Faculty, Bangladesh Maritime University

CamScanner

জলবায়ু সম্মেলন ও বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী

রায়হান আহমেদ তপাদার

ব্রাজিলের বেলেমে অনুষ্ঠিতব্য ৩০তম জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন শুধু একটি বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনার স্থান নয়, বরং এটি বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি ও মানবিক সংকট তুলে ধরার সবচেয়ে বড় জায়গা। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেইনফরেস্টের কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন প্রমাণ করছে যে জলবায়ু সমস্যা আর কেবল বিজ্ঞানের বিষয় নয়, বরং আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও বেঁচে থাকার লড়াই। ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে আস্থা সংকট, জলবায়ু অর্থায়নের অস্পষ্টতা, এবং বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি দেখিয়ে দিচ্ছে যে হাতে আর সময় নেই। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায়, ১.৫°C লক্ষ্যকে আইনি মানদণ্ডে উন্নীত করা, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে যাওয়ার দাবি এবং 'বাকু-টু-বেলেম' রোডম্যাপ-সব মিলিয়ে কপ৩০ এমন এক সন্ধিক্ষণ, যা হয় টেকসই ভবিষ্যতের দিকে পথ দেখাবে, নতুবা জলবায়ু প্রতিশ্রুতির ইতিহাসে আরেকটি ব্যর্থ অধ্যায় যোগ করবে। জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যবিষয়ক সর্বশেষ প্রতিবেদনটি এক কঠোর ও জটিল বাস্তবতা তুলে ধরেছে-বিশ্বজুড়ে প্রায় ৯৫ কোটি মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, অপর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং লাগাতার অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে এক ত্রিমুখী সংকটের সম্মুখীন। এই বিপুলসংখ্যক মানুষ কেবল পরিসংখ্যানের সমষ্টি নয়, তারা এমন বাস্তব জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা বেঁচে থাকা এবং হতাশার এক অনিশ্চিত ভারসাম্যের মধ্যে আটকে আছে। এই চিত্র স্পষ্ট করে, বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন এখন প্রথাগত আয়-ভিত্তিক পরিমাপের তুলনায় অনেক বেশি ভঙ্গুর ও জটিল। দারিদ্র্য এখন শুধু আয়ের ঘাটতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, আবাসন ও জ্বালানি ব্যবহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আন্তঃসংযুক্ত ঘাটতিতে বিস্তৃত হয়েছে, যা দুর্বলতার গভীর স্তর তৈরি করছে এবং মানবমর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন আজ আর কোনো বৈজ্ঞানিক বিতর্ক বা অনুমানের বিষয় নয়, এটি আমাদের চোখের সামনে ঘটতে থাকা এক ভয়াবহ বাস্তবতা। বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ও দাবানল আজ প্রায় প্রতিদিনের খবর। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক ২০২৫ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত দশকে গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা শিল্প-পূর্ব সময়ের তুলনায় ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে, যা মানবসভ্যতার জন্য এক ভয়াবহ সতর্ক সংকেত। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শিকার। এই সংকট এখন আর ভবিষ্যতের হুমকি নয়, বরং প্রতিনিয়ত মানুষের জীবন, জীবিকা ও ভবিষ্যৎকে বিপর্যস্ত করছে। দুনিয়াজুড়ে পরিবেশ-প্রতিবেশকে বিবেচনায় না নিয়ে যেসব উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলছে তার ফলে মানুষসহ প্রাণ-প্রকৃতি আজ চরম ঝুঁকির মুখে। এমনই এক বাস্তবতার মধ্যে ১৯৯২ সালে গঠিত ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি) ৩৩ বছর পার করেছে। এ প্রক্রিয়ায় ১০-২১ নভেম্বর পর্যন্ত ব্রাজিলের বেলিম শহরে ৩০তম কপ বা জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেখানে বিশ্বনেতা, বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, বিনিয়োগকারী, নাগরিক প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী, করপোরেট ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন। বিগত ২৯টি জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বনেতারা পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সুরক্ষা, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও জনগোষ্ঠীর মিটিগেশন, অভিযোজন ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় দক্ষতা-সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিপূরণ, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েই চলেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: প্রথম জলবায়ু সম্মেলন বা কপ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে জার্মানির বার্লিন শহরে যেখানে উন্নত দেশগুলোর কার্বন নির্গমণের হার ২০০০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের নির্গমণের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৯৭ সালে কপ৩ সম্মেলনে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখতে অতিমাত্রায় কার্বনসহ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে 'কিয়োটো প্রটোকলে' প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলো (অ্যানেক্স-এ ভুক্ত)। ২০১৫ সালে কপ২১ সম্মেলনে প্যারিস চুক্তি যা একটি সর্বজনীন আইনি বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তি। যেখানে সব রাষ্ট্রই গ্রিনহাউজ গ্যাস প্রশমন, অভিযোজন ও অর্থায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। তাছাড়া এ চুক্তিতেই বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ২০২১ সালে কপ২৬ সম্মেলনে গ্লাসগোয় গৃহীত অন্যতম প্রতিশ্রুতি হলো জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও কার্বন নিঃসরণের মাত্রা পর্যায়ক্রমে হ্রাস অথবা পর্যায়ক্রমে বন্ধ এবং অভিযোজনের অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করা। ২০২৩ সালের কপ২৮ দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জলবায়ু ক্ষতিপূরণ তহবিল (লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড) গঠন ও তার কার্যকারিতা নিশ্চিত, কার্বন নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস ও প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যগুলোর অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য কৌশল নির্ধারণ এবং তা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ২০২৪ সালে কপ২৯ সম্মেলন আজারবাইজানের বাকুতে জলবায়ু অর্থায়নের ওপর জোর দেয়া হয়। সম্মেলনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০৩৫ সালের মধ্যে ধনী উন্নত দেশগুলো ন্যূনতম ৩০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ, প্যারিস চুক্তির ধারার ৬ বাস্তবায়নে বৃহত্তর আঙ্গিকে ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলারের তহবিল সংগ্রহ করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছায়।এ পর্যন্ত যেসব প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেখানে প্রধানত দুটি ইস্যু। প্রথমটি হলো কার্বনসহ গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা, দ্বিতীয়টি হলো জলবায়ু ক্ষতি মোকাবেলায় অর্থায়ন। কিন্তু ১৯৯৫ সালের প্রথম সম্মেলনে গ্রিনহাউজ গ্যাসের উদ্গীরণ হ্রাসের প্রতিশ্রুতি হলেও ৩০ বছর ধরে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েই চলছে। গ্লোবাল কার্বন বাজেটের (২০২৪) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৯৫ সালে বৈশ্বিক গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ যেখানে ছিল ২৭ দশমিক ৯ বিলিয়ন টন, ২০২৪-এ এসে সেই নির্গমনের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৪১ দশমিক ৬ বিলিয়ন টনে এসে দাঁড়িয়েছে, যার বৃদ্ধির হার ৪৯ শতাংশ। গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের সঙ্গে বেড়ে চলেছে মানুষের জীবন ও জীবিকার ভোগান্তি; পরিবেশ-প্রতিবেশের অবক্ষয়। পাশাপাশি জলবায়ু অর্থায়নে নানাভাবে নানা তহবিল গড়ে উঠলেও প্রান্তিক ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এর আওতায় কতটুকু এসেছে তা একটি বড় জিজ্ঞাসা। জলবায়ু অর্থায়নের যে শাখা-প্রশাখা গজিয়েছে তা বিশ্লেষণ করে কতটুকু ঋণ আর কতটুকু সহায়তা বা ক্ষতিপূরণ-এটা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। জলবায়ু সংকট, যুদ্ধ, নিপীড়ন ও খাদ্য-জল সংকটকে আরো তীব্র করে ঝুঁকি গুণক হিসেবে কাজ করছে, যার ফলে বাস্তুচ্যুত মানুষের মোট সংখ্যা ২০২৫ সালের মধ্যে ১১ কোটি ৭০ লক্ষে পৌঁছেছে। ২০২৪ সালে ব্রাজিলের বন্যায় ৫.৮ লাখ মানুষ, মিয়ানমারে ঘূর্ণিঝড় মোচায় শরণার্থী রোহিঙ্গারা এবং চাদে বন্যায় ১.৩ মিলিয়ন মানুষ পুনরায় বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যা নির্দেশ করছে যে, জলবায়ু দুর্যোগ এখন বারবার স্থানচ্যুতির প্রধান চালক হয়ে উঠছে। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক বাস্তুচ্যুত মানুষ রাজনৈতিকভাবে ভঙ্গুর দেশগুলোতে সংঘাত ও জলবায়ুর প্রভাবে বিপন্ন, যেমন সুদান, সিরিয়া, হাইতি, কঙ্গো, লেবানন, মায়ানমার, বাংলাদেশ ও ইয়েমেন উল্লেখযোগ্য। এই দেশগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে নগণ্য অবদান রাখলেও জলবায়ু অর্থায়ন ও অভিযোজন ফান্ড থেকে বঞ্চিত রয়েছে।ব্রাজিলে কপ৩০-এ জলবায়ু আলোচকদের এই দ্রুত বাড়তে থাকা জনসংখ্যার দিকে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বলেন-'অর্থায়ন হ্রাসের ফলে শরণার্থী এবং বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোকে চরম আবহাওয়ার প্রভাব থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা মারাত্মকভাবে সীমিত হচ্ছে'। আমরা যদি স্থিতিশীলতা চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই এমন জায়গায় বিনিয়োগ করতে হবে যেখানে মানুষ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। ভবিষ্যতে বাস্তুচ্যুতি রোধ করতে, জলবায়ু অর্থায়ন শীঘ্রই প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাসকারী সম্প্রদায়গুলোতে পৌঁছাতে হবে। কপ৩০-কে ঘিরে বৈশ্বিক জলবায়ু কূটনীতিতে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করছে। বরাবরের মত এবারও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জলবায়ু পরিবর্তনকে সবচেয়ে বড় প্রতারণা হিসেবে আখ্যা দিয়ে সম্মেলনে উপস্থিত না হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তিনি সরাসরি অংশ না নিলেও দূর থেকে চাপ, হুমকি ও বাণিজ্যিক প্রতিশোধের কৌশল ব্যবহার করে বৈশ্বিক জলবায়ু সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারেন। এর উদাহরণ পাওয়া গেছে আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থার বৈঠকে, যেখানে ট্রাম্পের প্রভাবের কারণে কার্বন শুল্ক অনুমোদন এক বছর পিছিয়ে যায়। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করেছে। অপরদিকে, চীন সম্মেলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নতুন এসডিসি নিয়ে সমালোচনা থাকলেও, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে দ্রুত অগ্রগতির কারণে দেশটি আলোচনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগামী দশকগুলোয় জলবায়ু, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হতে হবে, যা শাসন, সংহতি ও সহনশীলতার পরীক্ষা নেবে। প্রতিটি ব্যক্তির নিরাপত্তা, শিক্ষা ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের অধিকার নিশ্চিত করার অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতিই ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করতে পারে। উন্নয়নকে কেবল জিডিপির প্রবৃদ্ধি দিয়ে পরিমাপ না করে সমাজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের রক্ষা করার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে পরিমাপ করতে হবে। নীতি ও বিনিয়োগের মাধ্যমে এই দুর্বল পরিস্থিতিকে সম্মিলিতভাবে বেঁচে থাকা এবং সমৃদ্ধি ভাগ করে নেয়ার পথে স্থানান্তরিত করা সম্ভব।

জলবায়ু পরিবর্তন আজ আর কোনো বৈজ্ঞানিক বিতর্ক বা অনুমানের বিষয় নয়, এটি আমাদের চোখের সামনে ঘটতে থাকা এক ভয়াবহ বাস্তবতা। বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ও দাবানল আজ প্রায় প্রতিদিনের খবর। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক ২০২৫ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত দশকে গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা শিল্প-পূর্ব সময়ের তুলনায় ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে, যা মানবসভ্যতার জন্য এক ভয়াবহ সতর্ক সংকেত। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শিকার। এই সংকট এখন আর ভবিষ্যতের হুমকি নয়, বরং প্রতিনিয়ত মানুষের জীবন, জীবিকা ও ভবিষ্যৎকে বিপর্যস্ত করছে। দুনিয়াজুড়ে পরিবেশ-প্রতিবেশকে বিবেচনায় না নিয়ে যেসব উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলছে তার ফলে মানুষসহ প্রাণ-প্রকৃতি আজ চরম ঝুঁকির মুখে

মানবমর্যাদা, জলবায়ু অভিযোজন, সামাজিক সুরক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং সমপ্রদায়ের ক্ষমতায়নকে কেন্দ্র করে দুর্বলতাকে স্থিতিস্থাপকতায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে, যা আমাদের বর্তমান সময়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ। জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং ভঙ্গুর সামাজিক ব্যবস্থা জীবিকা, সংহতি ও মর্যাদার জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে। এ অবস্থায় পদ্ধতিগত সংস্কার, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন অপরিহার্য। পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা কেবল দুর্ভোগকে আরো বাড়িয়ে তুলবে, তাই সক্রিয় ও মানবকেন্দ্রিক পদক্ষেপ আগামীকালের গল্প পুনর্লিখন করতে পারে, যা হবে হতাশার নয়, বরং স্থিতিস্থাপকতা ও সম্মিলিত অগ্রগতির। এই বাধ্যবাধকতা সুস্পষ্ট-বিশ্বব্যাপী ও জাতীয় নেতাদের অবশ্যই উন্নয়নের কেন্দ্রে মানবিক মর্যাদা, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি স্থাপন করতে হবে।

লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক, যুক্তরাজ্য
raihan567@yahoo.com

CamScanner

তরুণ বেকারত্ব : দক্ষতা নাকি সুযোগের ঘাটতি

আরিফুল ইসলাম রাফি

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ আজ সম্ভাবনার যে উচ্চতায় দাঁড়িয়ে, সেখানে সবচেয়ে বড় সম্পদ আমাদের তরুণ সমাজ। কিন্তু এই সম্ভাবনাই আজ বড় সংকটে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার তরুণ বেরিয়ে আসছে, হাতে ডিগ্রি, চোখে স্বপ্ন; তবুও একটি বড় অংশ নিজেদের জন্য উপযুক্ত কর্মজীবন খুঁজে পাচ্ছে না। তরুণ বেকারত্ব তাই শুধু ব্যক্তিগত নয়; এটি জাতীয় উদ্বেগ, যেটি অর্থনীতি, সমাজ, পরিবার এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্থিতির ওপর প্রভাব ফেলছে। আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এগোচ্ছি ঠিকই; কিন্তু তরুণদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে একটি গভীর অমিল ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দেশের জনসংখ্যা গঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশটি হলো তরুণসমাজ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নানা সূচকে আমরা উন্নতির গল্প শোনালেও তরুণদের কর্মসংস্থানের চিত্র এ দেশকে অন্য বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। ডিগ্রি অর্জন, প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা এবং আধুনিক চিন্তায় স্বতঃস্ফূর্ততা থাকা সত্ত্বেও বিপুলসংখ্যক তরুণ এখনো কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারছে না। সমস্যাটি শুধু ব্যক্তিগত সংসার-অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা তৈরি করছে না, বরং জাতীয় সম্ভাবনার বৃহত্তর অংশকে স্থবির করে দিচ্ছে। আজকের তরুণরা যে সুযোগের প্রত্যাশা করে, দেশের বর্তমান কাঠামো সেই প্রত্যাশার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটেছে; বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষার্থী প্রবাহ বেড়েছে, উচ্চশিক্ষা এখন আগের চেয়ে বহু বেশি সহজলভ্য। কিন্তু সহজলভ্যতা মানেই উপযোগিতা নয়। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগত তত্ত্বনির্ভর, পরীক্ষানির্ভর এবং কর্মজীবনের বাস্তব প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে গেছে। ফলে বিপুলসংখ্যক তরুণ ডিগ্রি হাতে পেলেও কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শেখানো জ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রের চাহিদার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান তৈরি হয়েছে, যা বেকারত্বের মূলভিত্তি আরও কঠোর করে তুলেছে।

দক্ষতার অভাব নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়; ইংরেজিতে দুর্বলতা, যোগাযোগ দক্ষতার সীমাবদ্ধতা, প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অনভিজ্ঞতা, দলগত নেতৃত্বে পিছিয়ে থাকা। সত্যিই এসব সমস্যা রয়েছে; তবে সমস্যা এখানেই শেষ নয়। দক্ষতা থাকা মানেই চাকরি নিশ্চিত, এই ধারণা বাস্তবে আর টিকে নেই। দেশে প্রতি বছর যে সংখ্যায় তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে, সেই তুলনায় নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয় বহু কম। দক্ষতা বাড়ানোর দাবি ঠিকই; কিন্তু সুযোগ সৃষ্টি না হলে দক্ষতার চমকও কোনো ব্যবহার খুঁজে পায় না। অর্থনীতির কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এখানে তরুণদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।

বাংলাদেশে শিল্পায়ন এখনও সীমিত কয়েকটি খাতকেন্দ্রিক। পোশাকশিল্প দেশের প্রধান রপ্তানি খাত হলেও সেখানে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার থমকে গেছে। অটোমেশন বাড়ায় কম দক্ষ শ্রমের প্রয়োজন কমছে। নতুন শিল্প খাতগুলো: ফার্মাসিউটিক্যালস, আইটি ইলেকট্রনিকস, সিরামিক, ই-কমার্স। এগুলো বিকাশমান হলেও তরুণদের বিশাল সংখ্যাকে ধারণ করার মতো কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারেনি। ফলে দক্ষতা থাকলেও কাঙ্ক্ষিত চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয় না। তিনটি খাতের ওপর রাষ্ট্রের অতিরিক্ত নির্ভরতা শ্রমবাজারকে সংকুচিত করে রেখেছে, যেখানে নতুন প্রজন্মের জন্য দরকার ছিল বহুমুখী শিল্প বিস্তার।

সরকারি চাকরির প্রতি তরুণদের আকর্ষণ আমাদের সামাজিক কাঠামোর এক ঐতিহ্যগত ধারা। নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, স্থায়িত্ব- এই তিনটি কারণে লাখ লাখ তরুণ সরকারি চাকরির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু সেই সুযোগ সীমিত, পদের সংখ্যা অল্প, প্রতিযোগী বিশাল। ফলে এই একমাত্র লক্ষ্যই তরুণদের সময়, সম্ভাবনা ও শক্তির একটি বড় অংশ গ্রাস করে। বহু প্রতিযোগী বছরের পর বছর চেষ্টা করে হতাশ হয়ে পড়ছে, অথচ অন্য খাতে তাদের দক্ষতা কাজে লাগানোর জন্য যথেষ্ট দিকনির্দেশনা ও পেশাগত পরিকাঠামো নেই। ফলে চাকরি প্রাপ্তিতে ব্যর্থতা তরুণদের মানসিক ও আর্থিক সংকট আরও জটিল করে তোলে।

বিদেশে কর্মসংস্থানও বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় অংশ। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য ও কয়েকটি রাষ্ট্রের শ্রমবাজার দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তারা এখন অদক্ষ শ্রমিক নয়; প্রযুক্তি-সচেতন, ইংরেজিতে যোগাযোগ সক্ষম এবং বিশেষজ্ঞ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ফলে আমাদের দেশের অদক্ষ বা কম দক্ষ তরুণরা আগের মতো বিদেশে সহজে যেতে পারছে না। এই পরিবর্তন দেশীয় শ্রমবাজারের ওপরও চাপ সৃষ্টি করছে, কারণ বিদেশে শ্রম রপ্তানির প্রবাহ কমলে দেশের বেকারত্ব অনিবার্যভাবেই বাড়ে। নতুন প্রযুক্তিগত বাস্তবতা তরুণদের সামনে আবারও দুই ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক অটোমেশন, মেশিন লার্নিং। এসব প্রযুক্তি বহু কাজ মানুষের পরিবর্তে করছে। ফলে কিছু কাজ একেবারেই বিলুপ্ত হচ্ছে। আবার নতুন কিছু কাজ তৈরি হচ্ছে– ডিজিটাল মার্কেটিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, অ্যানিমেশন, ডেটা অ্যানালাইসিস, কনটেন্ট ক্রিয়েশন, সাইবার সিকিউরিটি। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। ফলে নতুন প্রজন্মের দক্ষতার যে কাঠামো প্রয়োজন, তা গড়ে উঠছে না; আধুনিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা তাই আরও কঠিন হয়ে পড়ছে।

ব্যক্তিগত স্তরে তরুণরা যে হতাশার মুখোমুখি হয়, তার সামাজিক প্রভাবও কম নয়। বেকারত্বের সঙ্গে যুক্ত হয় আত্মবিশ্বাস হারানো, আত্মমর্যাদার সংকট, পারিবারিক চাপ, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অস্থিরতা। বহু তরুণ ডিগ্রি অর্জন করেই পরিবার ও সমাজে বহুল প্রত্যাশার ভার বইতে থাকে। চাকরি না পাওয়া মানে শুধু অর্থনৈতিক ব্যর্থতা নয়; এটি সামাজিকভাবে অযোগ্যতার মতো চাপ হিসেবে তরুণদের কাঁধে চেপে বসে। তরুণ বয়সেই হতাশা, ভেঙে পড়া, আত্মনির্ভরতা হারানো– এসব একটি জাতির ভবিষ্যৎ শক্তি কমিয়ে দেয়।

তবে দায় একমাত্র তরুণদের নয়; কাঠামোই তাদের সীমাবদ্ধ করছে। সরকার-বেসরকারি খাত ও শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কার্যকর নীতিগত সমন্বয় না থাকলে সমস্যার গভীরতা আরও বাড়বে। বিরাজমান কাঠামো পরিবর্তনের জন্য শক্তিশালী শিল্পনীতি, বাজারচাহিদা গবেষণা, টেকনিক্যাল শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধি, শিক্ষাক্রমে সফট স্কিল সংযোজন এবং নতুন খাতে বিনিয়োগকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারে আনা জরুরি। বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দেখলে বোঝা যায়, টেকনিক্যাল শিক্ষা ও বাজার চাহিদানির্ভর কোর্সই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির আসল সহায়ক।

এখনও সময় আছে, পরিবর্তন সম্ভব। ডিজিটাল অর্থনীতি, ফ্রিল্যান্সিং, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, ই-কমার্স, ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি– এসব খাতে বাংলাদেশের তরুণেরা এরইমধ্যে সম্ভাবনার আলো দেখিয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনা বাস্তব কর্মসংস্থান হয়ে উঠবে শুধু তখনই, যখন রাষ্ট্র শিক্ষা ও শিল্পের সংযোগ সুদৃঢ় করবে। উদ্যোক্তা পরিবেশকে আরও স্বচ্ছ ও ঝুঁকি হ্রাসকারী করতে হবে, যাতে নতুন উদ্যোক্তারা টিকে থাকার সুযোগ পায়। পাশাপাশি তরুণদেরও বুঝতে হবে যে সরকারি চাকরিই একমাত্র গন্তব্য নয়; নতুন পৃথিবী নানা পথের দরজা খুলে দিয়েছে। তাই স্পষ্ট, তরুণ বেকারত্বের দায় শুধু দক্ষতার অভাবের ঘাড়ে চাপালে সমস্যার অর্ধেকটাই উপেক্ষা করা হয়। আবার শুধু সুযোগের সংকটকে দায়ী করলেও সমাধান আসবে না। এ দুটির জটিল সম্পর্ক একটি চক্র তৈরি করেছে। শিক্ষায় দুর্বলতা, দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা, শিল্পে সংকট, চাকরির ঘাটতি এবং হতাশা– এই পরস্পরনির্ভর চক্র ভাঙতে হলে জাতীয় অগ্রাধিকার বদলাতে হবে। কারণ তরুণদের প্রত্যাশা পূরণ মানে শুধু কয়েক লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি নয়; এটি একটি জাতির শক্তি, স্থিতি, আস্থা ও ভবিষ্যৎ নির্মাণ।

তরুণদের সম্ভাবনা অবারিত; কিন্তু সম্ভাবনাকে সফলতার দিকে নিয়ে যেতে রাষ্ট্র, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি– সবার ভূমিকা দরকার। যারা দক্ষতা তৈরি করবে তাদের জন্য সুযোগ থাকতে হবে; আর যেখানে সুযোগ নেই সেখানে দক্ষতা গড়ে উঠলেও তা অপচয় হয়। বাংলাদেশের উন্নয়নের ভবিষ্যৎনির্ভর করছে এই সহজ সত্যকে বাস্তব নীতিতে রূপ দিতে পারার ওপর। তরুণরা যদি নিজেদের পথ খুঁজে পায়, রাষ্ট্র তার সঠিক ভূমিকা পালন করে এবং সমাজ যদি পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, তবেই এই জনসমুদ্র বোঝা নয়, বরং শক্তি হয়ে উঠবে।

CamScanner